



[www.murchona.com](http://www.murchona.com)

## **Himur Rupali Ratri by Humayun Ahmed**



**For More Books Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)  
[suman\\_ahm@yahoo.com](mailto:suman_ahm@yahoo.com)**

ফাতেমা খালা একটা চিরকুট পাঠিয়েছেন। চিরকুটে লেখা—

হিমু,

এছনি চলে আয়, ম্যানেজারকে পাঠলাম। খবদার দেরি করবি না।

খুবই জরুরী। Very urgent.

ইতি

ফাতেমা খালা।

ম্যানেজার ভদ্রলোক গভীর মুখে বসে আছেন। তার পায়ে স্যুট। পায়ে কাপো রঙের জুতা। মনে হয় আসার আগে পালিশ করিয়ে এনেছেন। জুতা জোড়া আয়নার মত চকচক করছে। গলায় সবুজ রঙের টাই। বেশির ভাগ মানুষকেই টাই মানায় না। ইনাকে মানিয়েছে। মনে হচ্ছে ইনার গলাটা তৈরিই হয়েছে টাই পরার জন্যে। ভদ্রলোক আফটার শেভ লোশন, কিংবা সেট মেখেছেন। মিষ্টি গন্ধ আসছে। তার চেহারাও সুন্দর। ডরাট মুখ। ঝকঝকে শাদা দাঁত। বিদেশী টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে এই দাঁত ব্যবহার করা যেতে পারে। ভদ্রলোককে ফাতেমা খালার ম্যানেজার বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। বোঝাই যাচ্ছে, আমার ঘরটা তাঁর খুবই অপছন্দ হচ্ছে। তিনি সম্ভবত কোন বিকট দুর্গন্ধ পাচ্ছেন। কারণ কিছুক্ষণ পরপরই চোখ-মুখ কুটকে ফেলে নিঃশ্বাস টানছেন। পকেটে হাত দিচ্ছেন, সম্ভবত রুমালের খোঁজে। তবে ভদ্রতার খাতিরে রুমাল দিয়ে নাকচাপা দিচ্ছেন না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। সম্ভবত দুর্গন্ধ কোথেকে আসছে তা বের করার চেষ্টা।

ভদ্রলোক অস্থির গলায় বললেন, 'বসে আছেন কেন? চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'কোথায় চলব?'

ভদ্রলোক অতিরিক্ত রকমের বিখিত হয়ে বললেন, 'আপনার খালার বাসায়। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

'দেঁরি হবে। হাত-মুখ ধোব, চা-নাশতা করব।'  
 'চা-নাশতা ম্যাডামের বাসায় করবেন। চট করে মুখটা শুধু ধুয়ে নিন।'  
 'মুখ ধুতেও দেঁরি হবে। ঘন্টা দুই লাগবে।'  
 উদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ার মত করে বললেন, 'মুখ ধুতে দু'ঘন্টা লাগবে?'

আমি আবাবো হাই তুলতে তুলতে (এবারের হাইটা নকল হাই) বললাম, 'বেশিও লাগতে পারে। আমাদের এই মেসে একটা মোটে বাধকর্ম। ক্রিশজ্ঞন বোর্ডার। ক্রিশজ্ঞন বোর্ডারের সঙ্গে সব সময় থাকে গোটা দেশক আখীয়, কিছু দেশের বাড়ির মানুষ। সব মিলিয়ে গড়ে চল্লিশজ্ঞন। এই চল্লিশজ্ঞনের সঙ্গে আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে। সকালবেলার দিকে লথা লাইন হয়।'  
 'দু'ঘন্টা অপেক্ষা করা সম্ভব না। আপনি গাড়িতে উঠুন। হাত-মুখ আপনার খালার বাড়িতে ধুবেন। সেখানকার ব্যবস্থা অনেক ভাল।'  
 উদ্রলোকের গলায় এখন হুকুমের সুর বের হচ্ছে। সুট-টাই পরা মানুষ অবশ্য নরম স্বরে কথা বলতে পারে না। আপনাতাই তাদের গলার স্বরে একটা ধমকের ভাব চলে আসে। অবশ্য সুট পরা মানুষ মিনমিন করে কথা বললে শুনতেও ভাল লাগে না। তাদেরকে ঘরজামাই মনে হয়। শওরবাড়ির সুটে পার্শ্বনিষিদ্ধি আসে না।  
 'একি এখনো বসে আছেন? বললাম না, চলুন।'  
 আমি চৌকি থেকে নামতে নামতে বললাম, 'আজ কি ব্যার?'  
 'মঙ্গলবার।'  
 আমি আবাবো ধপ করে চৌকিতে বসে পড়লাম। চিত্তিত ভঙ্গিতে বললাম, 'মঙ্গলবার যদি হয়, তাহলে যাওয়া যাবে না। মঙ্গলবার যাত্রা নাস্তি।'  
 'যাবেন না?'  
 'জ্বি না। আপনি বরং বুধবারে আসুন।'  
 'বুধবারে আসব?'  
 'জ্বি। বনার বচনে আছে — বুধের ঘাড়ে দিয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।'  
 ম্যানেজার চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে খনার বচন শোনা তাঁর অভ্যাস নেই। তিনি মনে হয় খানিকটা রেগেও যাচ্ছেন। চোখ ছোট ছোট হয়ে গেছে। রাগলে মানুষের চোখ ছোট হয়ে যায়। আনন্দিত মানুষের চোখ হয় বড় বড়।  
 'হিমু সাহেব।'  
 'জ্বি।'

'আপনাকে যেতেই হবে। ম্যাডাম আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনাকে নিয়ে যেতে। আমি না নিয়ে যাব না। আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধোব, চা-নাশতা খান, ইচ্ছে করলে আরো খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করুন। আমি কছি। দু'ঘন্টা কেন, দরকার হলে সাত ঘন্টা বসে থাকব। কিছু মনে করবেন না, নাশতা কি নিজেই বানাবেন?'

'জ্বি না। ছক্কু দিয়ে যাবে।'  
 'ছক্কুটা কে?'  
 'বিসমিল্লাহ রেস্তুরেন্টের ব্যয়।'  
 'ছক্কু নাশতা কখন দিয়ে যাবে?'  
 'হাত-মুখ ধুয়ে এসে উত্তর দিকের এই জানালাটা খুলে দেব। এটাই হল আমার সিপন্যাল। বিসমিল্লাহ রেস্তুরেন্ট থেকে আমার ঘরের জানালা দেখা যায়। ছক্কু আমার ঘরের জানালা খোলা দেখে বুঝবে আমি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলেছি। সে নাশতা নিয়ে চলে আসবে। পরোটা-ভাজি।'  
 'কিছু মনে করবেন না, আমি এখনই জানালাটা খুলে দি। আপনার হয়ে সিপন্যাল দিয়ে দি। নাশতা চলে আসুক। নয়ত নাশতার জন্যে আবার এক ঘন্টা কসতে হবে।'  
 'আগেভাগে জানালা খোলা ঠিক হবে না। আমার ঘরটা নর্দমার পাশে জো—বিকট গন্ধ আসবে। আপনি নতুন মানুষ। আপনার অসুবিধা হবে। শুধু রুমালে কাঁজ হবে না। গ্যাস মাষ্ক পরতে হবে।'  
 উদ্রলোক বিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিছু কিছু মানুষ আছে — সহজে বিমিত হয় না। তারা যখন বিমিত হয় তখন দেখতে ভাল লাগে। এই উদ্রলোক মনে হচ্ছে সেই দলের। তার বিমিত দৃষ্টি দেখতে ভাল লাগছে। তাকে আরো খানিকটা ভড়কে দিলে কেমন হয়?  
 'ম্যানেজার সাহেব! আপনার নাম কি?'  
 'রকিব! রকিবুল ইসলাম।'  
 'আপনি ভাল আছেন?'  
 রকিবুল ইসলাম জবাব দিলেন না। সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বোধহয় তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান ন।  
 'ফাতেমা খালার ম্যানেজারী কতদিন হল করছেন?'  
 'বেশিদিন না, দু'মাস।'

**For More Books Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)**

'খালার অবস্থা কি? তার মাথা কি পুরোপুরি আউলা হয়ে গেছে— না এখনো কিছু বাকি আছে?'

'কি বলছেন আপনি, মাথা আউলা হবে কেন?'

'গুপ্তধন পেলে মানুষের মাথা আউলা হয়। খালা গুপ্তধন পেয়েছেন। গুপ্তধন এখনো আছে, না খরচ করে ফেলেছেন?'

মানোজ্ঞার পঞ্জীর ভঙ্গিতে বললেন, ম্যাডাম সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। উনি আপনার খালা। উনার সম্পর্কে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আমি পারি না। আমি তার এমপ্রয়ী। আমার অনেক দায়িত্বের একটি হল তার সমান রক্ষা করা। হিমু সাহেব, আপনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করছেন। আপনি বরং দয়া করে বাথরুমের লাইনে দাঁড়ান। উত্তরের জানালা খোলার দরকার নেই। আমি বিস্মিত্রাহ রেইক্রেটে গিয়ে ছক্কে নাশতা দিতে বলে আসছি।

'ফন্যবাদ!'

'আর আপনি যদি চান, আমি আপনার হয়ে লাইনেও দাঁড়াতে পারি।

'এই বুদ্ধিটা খারাপ না। আপনি বরং লাইনে দাঁড়ান। আমি চট করে রেইক্রেট থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি। কোঠ পরিষ্কারের জন্যে খালি পেটে চায়ের কোন ডুলনা নেই। কড়া এক কাপ চা। চায়ের সঙ্গে একটা অজিঞ্জ বিড়ি। ভাইরেই একশান। কোঠের জগতে তোলপাড়। কোঠ মানে কি জানেন তো? কোঠ মানে হচ্ছে গু। কোঠ কাঠিন্য মানে কঠিন গু।'

রুকিবুল ইসলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এরকম কঠিন চোখে অনেক দিন কেউ আমার দিকে তাকায়নি।

দোতলায় নেমে এলাম। মেসের কেয়ার টেকার হাবীব সাহেব (আড়ালে ডাকা হয় হাবা সাহেব। যদিও তিনি মোটেই হাবা না। চালাকের ছুড়ান্ত। সুগার কুটেট কুইনাইনের মত হাবা কোটেট বুদ্ধিমান।) বললেন, 'হিমু ভাই, আজকের কাগজ পড়েছেন?'

আমি বললাম, 'না।'

'ভয়াবহ ব্যাপার। আবার একটা ন' বছরের মেয়ে রেপড হয়েছে। একটু দাঁড়ান, পড়ে শোনাই।'

'এখন গুনতে পারব না। আপনি ভাল করে পড়ে রাখুন — পরে শুনে নেব।'

'মেয়েটার নাম মিতু। যাত্রাবাড়িতে বাসা। বাবা রিকশা চালায়।'

'ও আচ্ছ।'



'আমি একটা ফাইলের মত করছি। সব রেপের নিউজ কাটিং জমা করে রাখছি।'

'ভাল করছেন।'

হাবা সাহেবের হাত থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যায় না। ভাগ্য ভাল তাঁর হাত থেকে আজ সহজেই ছাড়া পাওয়া গেল। ভাগ্য একবার ভাল হওয়া শুরু হলে ভালটা চলতেই থাকে। অতি সহজে বাথরুমেও ঢুকে পড়তে পারলাম। মনের আনন্দে দু' লাইন গানও গাইলাম —

"জীবনের পরম লগ্ন করো না হেলা  
হে পরবিনী।"

রবীন্দ্রনাথ কি কোনদিন ভেবেছিলেন তার গান সবচে বেশি গীত হবে বাথরুমে! এমন কোন বাঙালি কি আছে যে বাথরুমে ঢুকে দু' লাইন গুণগুণ করেনি!

বাথরুমকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। জগতের মহতম চিত্তাগুলি করা হয় বাথরুমে। আমি অবশ্য এই মুহুর্তে তেমন কোন মহৎ চিন্তা করছি না। ফাতেমা খালার কথা ভাবছি— হঠাৎ খোঁজ করছেন, ব্যাগারটা কি?

ফাতেমা খালার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি বেশ সহজ স্বাভাবিক মহিলাই ছিলেন। জর্দা দিয়ে পান খেতেন। আধহ নিয়ে টিভির নাটক, ছায়াছন্দ এবং বাংলা সিনেমা দেখতেন। ম্যাগাজিন পড়তেন (তাঁর ম্যাগাজিন পড়া বেশ অভ্যস্ত। মাঝখানের পৃষ্ঠা খুলবেন। সেখান থেকে পড়া শুরু হবে)। খালা দু'টা ভিডিও ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ক্লাব থেকে লেটেষ্ট সব হিন্দী ছবি নিয়ে আসতেন। তাঁর ঘরের দু'জন কাজের মেয়েকে নিয়ে রাত জেগে হিন্দী ছবি দেখতেন। কঠিন কঠিন হিন্দী ডায়ালগ ওদের বুঝিয়ে দিতেন। অমিতাভ বচন কেন দিলীপ কুমারের চেয়ে বড় অভিনেতা— এই ধরনের উচ্চতর গবেষণা ওদের নিয়ে করতেন এবং ওদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন।

তাঁর একটা অটোমোবাইলের খাতাও ছিল। বাইরে বেরুলেই সেই খাতা তাঁর সঙ্গে থাকত। যে কোন সময় বিখ্যাত কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। খাতা সঙ্গে না থাকলে সমস্যা। নিউ মার্কেটে একদিন রুটি কিনতে গিয়ে আসাদুজ্জামান নূর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ফাতেমা খালাকে অটোমোবাইল দিলেন —

জয় হোক  
আসাদুজ্জামান নূর।

আরেকবার এলিফ্যান্ট রোডে দেখা হল চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে। মৌসুমী ম্যাডাম বোরকা পরে ছিলেন। তারপরেও ফাতেমা খালা তাকে চিনে ফেললেন। মৌসুমী ম্যাডামও অটোধাফ দিয়েছেন —

মানুষ হও  
মৌসুমী।

খালার জীবন মোটামুটি সুখেই কেটে যাচ্ছিল। সমস্যা বাধালেন খালু সাহেব। তিনি ফট করে একদিন মরে গেলেন।

ফাতেমা খালার জীবনধারায় বিরাট পরিবর্তন হল। তিনি পুরোপুরি দিশাহারা হয়ে গেলেন। খালাকে দোষ দেয়া যায় না। যে কোন মানুষই দিশাহারা হত। কারণ ছোট খালুর মৃত্যুর পর দেখা গেল এই উদ্বলোক কয়েক কোটি টাকা নানানভাবে রেখে গেছেন। ফাতেমা খালার মত ভয়াবহ খরচে মহিলার পক্ষেও এক জীবনে এত টাকা খরচ করার কোন উপায় নেই।

ছোট খালু মোহাম্মদ শফিকুল আমিন বিচিত্র মানুষ ছিলেন। তত্ত্বলোককে দেখেই মনে হত মাথা নিচু করে বসে থাকে ছাড়া তিনি কোন কাজ করেন না। বসে থাকে ছাড়া তিনি আর যা করেন তা হচ্ছে গায়ের চাদর দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার। শীত এবং গ্রীষ্ম দুই সিজনেই তিনি গায়ে চাদর পরতেন সর্ববৃত্ত পরিষ্কার। শীত এবং গ্রীষ্ম দুই সিজনেই তিনি গায়ে চাদর পরতেন সর্ববৃত্ত চশমার কাচ পরিষ্কারে সুবিধার জন্যে। মোহাম্মদ মুকাদ্দেস মিয়াকে দেখে কে বলবে তার নানান দিকে নানান ব্যবসা — রিক ফিল্ড, স্পিনিং মিলের শেয়ার, এলপোর্ট-ইমপোর্ট, গারমেন্টসের ব্যবসা, ট্রাঙ্গপোর্ট ব্যবসা।

ব্যবসায়ী মানুষ মাত্রই উদ্বেগের ভেতর বাস করে। ঘুমের অযুথ খেয়ে রাতে ঘুমায়। পীর-ফকিরের কাছে যাতায়াত করে। হাতে রংবের-এর পাথরওয়ালি আর্থট পরে। অল্প বয়েসেই তাদের ডায়ালিসিস, হার্টের অসুখ, হাই ব্লাড প্রেসার হয়। সবচে বোধি যা হয় তার নাম গ্যাস। ব্যবসায়ী মাত্রেরই পেট ভর্তি থাকে গ্যাস। মাঝারি টাইপের যে কোন ব্যবসায়ীর পেটের গ্যাস দিয়ে দুই বার্নারের একটা গ্যাস চুলা অনারাসে কয়েক ঘণ্টা জ্বালানো যায়। একমাত্র ছোট খালুকে দেখলাম গ্যাস ছাড়া। পেটে গ্যাস নেই, ব্যবসা নিয়ে কোন উদ্বেগও নেই। তাকে বেশির ভাগ সময়ই দেখেছি জ্বুথু হয়ে বসে থাকতে। আগবাড়িয়ে কারো সঙ্গে কথাও বলতেন না। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা এক বিয়েবাড়িতে। বিয়েবাড়ির হৈচৈ-এর মধ্যে তিনি এক কোণায় সোফায় পা উঠিয়ে বসে আছেন। মনে হল তার শীত করছে, কেমন গুটিসুটি মেয়ে বস। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'খালু সাহেব কেমন আছেন?'

তিনি নিচু গলায় বললেন, 'ভাল।'

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হাঁ।'

'তাহলে শুধু শুধু বসে আছেন কেন, চলে যান।'

'তোমার খালার জন্যে বসে আছি। একটু দেখবে — ও যাবে কিনা। মনে হয় না বিয়েবাড়ির মজা ফেলে যাবে।'

আমি খালাকে খুঁজে বের করলাম। তিনি হতভম্ব গলায় বললেন, 'পাগল! আমি এখন যাব কি? খাওয়া-দাওয়ার পর গান-বাজনা হবে। গান শুনব না? তুই তোর খালুকে চলে যেতে বল। গাড়িটা যেন রেখে যায়। হিমু শোন, তুই একটা উপকার করবি? তোর খালুর সঙ্গে বাসায় চলে যা। আমার অটোধাফের খাতাটা নিয়ে আস।'

'খাতা ফেলে এসেছ?'

'হাঁ। মাঝে মাঝে এমন বোকামি করি যে ইচ্ছা করে নিজেকেই নিজে চড় মারি। চড় মেরে চাপার দাঁত ফেলে দেই।'

'বিয়েবাড়িতে বিখ্যাত কেউ এসেছে?'

'তুই কি গাধা নাকি? দেখতে পাচ্ছিস না — জুয়েল আইচ সাহেব এসেছেন, উনার স্ত্রী বিপাশা আইচ এসেছেন। এরা কতক্ষণ থাকবেন কে জানে। তুই চট করে অটোধাফের খাতা নিয়ে আস। আমার ডেসিং টেবিলের উপর আছে। শুধু খাতা না, কলমও আনবি।'

আমি খালু সাহেবের সঙ্গে বাসায় গেলাম। ডেসিং টেবিলের উপর থেকে ফাতেমা খালার অটোধাফের খাতা উদ্ধার করলাম। খালু সাহেব গুণে গুণে সাত টাকা দিয়ে দিলেন ফেরার রিকশা ভাড়া। আমাকে বললেন, 'রিকশাওয়ালা আট টাকা চাইবে। দরাদরি করলে সাত টাকায় রাজি হবে।'

আমি কিছুক্ষণ বিম্বিত হয়ে খালুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আচ্ছা।' পরদিন খালু সাহেবকে আমি চার টাকা ফেরত দিয়ে বললাম, 'শেয়ারে রিকশা পেয়ে চলে গেছি। তিন টাকা নিয়েছে। আপনার চার টাকা বাঁচিয়ে দিলাম।'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ত্রিদিন গুণে গুণে সাত টাকা দিয়েছি বলে রাগ করছে?'

আমি বললাম, 'না, রাগ করব কেন?'

'মনে হয় রাগ করছে। রাগ না করলে এই চার টাকা ফেরত দিতে আসতে না। যাই হোক, তুমি কিছু মনে করো না। হিসেব করে করে এই অবস্থা হয়েছে। সারাক্ষণ হিসেব করি। গাড়িতে যখন তেল ভরি তখন হিসেব করি কতটুকু তেল

নিলাম। গাড়ি কতক্ষণ চলবে। এর আগে কবে তেল নিয়েছি। বুঝলে হিমু, আমি শান্তিমত পাঁচটা টাকাও খরচ করতে পারি না। ঐদিন কি হয়েছে শোন — গাড়ি করে যাচ্ছি মতিঝিল। শেরাটনের কাছে রোড লাইটে গাড়ি থেমেছে — ফুল বিক্রি করে একটা মেয়ে এসে ঘ্যানঘ্যান শুরু করল, ফুল নেন। ফুল নেন। আমি মুখ শক্ত করে বসে আছি। হঠাৎ দেখি আমার ড্রাইভার তার পকেট থেকে ফস করে একটা দশ টাকার নোট বের করে মেয়েটাকে দিয়ে দিল। আমি হতভয়।

'ড্রাইভারের কাণ্ড দেখে খুশি হলেন?'

'না। আমার মাথায় ঢুকে গেল, ড্রাইভার কি পয়সা মারছে? তেল চুরি করছে? নতুন টায়ার বিক্রি করে পুরান টায়ার লাগিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে? তা না করলে ফুলওয়ালীকে ফস করে দশ টাকার নোট দেয় কি করে?'

'আপনি ড্রাইভার হাঁটাই করে দিলেন?'

'ঠিক ধরেছে। নতুন ড্রাইভার নিলাম। আমি অবশ্য এমিটেই এক ড্রাইভার বেশিদিন রাখি না। চার মাসের বেশি কাউকেই রাখি না। ড্রাইভাররা শুরুতেই চুরি শুরু করে না। একটু সময় নেয়। আমি সেই সময় পর্যন্ত তাদের রাখি। তারপর বিদায়। সবই হচ্ছে আমার হিসেব। আমি বাস করি কঠিন হিসেবের জগতে।'

'তার জন্যে কি আপনার মন খারাপ হয়?'

'না, মন খারাপ হয় না। আমাকে তৈরিই করা হয়েছে এইভাবে — মন খারাপ হবে কেন? সাধু সন্ত মানুষ কি মন খারাপ করে — কেন তারা সাধু প্রকৃতির হল? না করে না। কারণ তাদের মনসিক গড়নটাই এমন। আমার বেলাতেও ভাই। এই যে তুমি হিমু সেক্ষেপে পথে পথে ঘুরে বেড়াও — তোমার কি মন খারাপ হয়?'

'না।'

'কফি খাবে?'

'কফিও নিশ্চয়ই আপনার হিসেব করা। আমি খেলে কম পড়বে না?'

'না, কম পড়বে না, খাও। কফি খেতে খেতে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

ছোট খালু নিজেই কফি বানালেন। টিনের কৌটা খুলে বিসকিট বের করলেন। কেক বের করলেন। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললেন, 'আলসারের মত হয়েছে। ডাক্তার শুধু চা কিংবা কফি খেতে নিষেধ করেছে। গরু ছাগলের মত সারাশরৎই কিছু খাই।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'নিজের জন্যে একটো খরচ করতে হচ্ছে —

এই জন্যে মনটা সব সময় খচখচ করে?'

'খালু সাহেব লজ্জিত মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, করে।'

'আচ্ছা খালু সাহেব, আপনার ঠিক কত টাকা আছে বলুন তো?'

'তেমনভাবে হিসেব করিনি। ভালই আছে।'

'ভালই মানে কি?'

'বেশ ভাল।'

'কোটির উপর হবে?'

'তা তো হবেই।'

একটা মানুষের কোটির উপর টাকা আছে, 'সে নির্বিচার ভঙ্গিতে কফি বানাচ্ছে ভেবেই আমার শীত শীত করতে লাগল। অবশ্য আজ এমিটেই শীত। কেভ ওয়েভ। শীতটা টের পাচ্ছিলাম না। এখন পাচ্ছি।

'খালু সাহেব চলুন একটা কাজ করি। এক রাতে আমরা দু'টা ফিফটিন সিটার মাইক্রোবাস ভাড়া করি। বাস ভরতি থাকবে কফল। শীতের রাতে আমরা শহরে ঘুরব — যেখানেই দেখব খালি গায়ে লোকজন শুয়ে আছে — ওমি দূর থেকে তাদের গায়ে একটা কফল ছুঁড়ে দিয়েই লাফ দিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পালিয়ে যাব। যাকে কফল দেয়া হয়েছে সে যেন ধন্যবাদ দেয়ার সূযোগও না পায়।'

'কাজটা কি জন্যে করব, সোয়াবের জন্যে? বেহেশতে যাতে হরপন্নী পাই?'

'না সোয়াব-টোয়াব না, হঠাৎ দামী কফল পেয়ে লোকগুলির মুখের ভাব দেখে মজা পাওয়া। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই মজার অংশ খুব কম। যাদের জীবনে মজার অংশ কম তারা অন্যদের মজা দেখে আনন্দ পায়। দুধের খাদ ভাতের মাড়ো মেটানোর মত।'

খালু সাহেব সিগারেট ধরালেন। শান্ত মুখে সিগারেট টান দিচ্ছেন, কিছু বলছেন না। আমি কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। ছোট খালু আমাকে বিস্থিত করে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। বাস ভর্তি কফল দেয়া যাক। কবে দিতে চাও?'

'পুরোটাই তো আপনার উপর। আপনি যে রাতে ঠিক করবেন, সেই রাতেই যাব। চলুন আজই যাই।'

'আজ না, তুমি আগামী সোমবারে এসো। রাত ন'টার দিকে চলে এসো।

এক সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে বের হয়ে পড়ব। রাত বারোটোর দিকে বের হব।'

'ঠিক আছে।'

'আমি কফল কিনিয়ে রাখব। হাজার পাঁচেক কফল কিনলে হবে না?'

'অবশ্যই হবে। কঞ্চল দিয়ে একবার যদি মজা পেয়ে যান তাহলে আপনি কঞ্চল দিতেই থাকবেন। কে জানে আপনার নামই হয়ত হয়ে যাবে শফিকুল আমিন কঞ্চল।'

খালু সাহেব আমার রসিকতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিচুলায় বললেন, 'কঞ্চল দেয়া যেতে পারে। আমার যে মাঝে মাঝে দিতে ইচ্ছা করে না, তা না। কেন জানি শেষ পর্যন্ত দেয়া হয় না।'

সোমবার রাত বারোটায় তাঁর কঞ্চল নিয়ে বেরুবার কথা, উনি মারা গেলেন শনিবার সকাল দশটায়। অফিসে যাবার জন্যে কাপড় পরেছেন, ফাতেমা খালাকে বললেন, 'একটা স্যুয়েটার দাও তো। ভাল ঠাণ্ডা লাগছে, শুধু চাদরে শীত মানছে না।'

খালা রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। তিনি বললেন, 'আমার হাত বন্ধ, তুমি নিজে খুঁজে নাও। আলমিরায় আছে। নিচের তাকে দেখ।'

খালু সাহেব নিজেই স্যুয়েটার খুঁজে বের করলেন। স্যুয়েটার পরলেন না। হাতে নিয়ে খাবার ঘরে বসে রইলেন। ফাতেমা খালা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে অর্ধেক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার, তুমি অফিসে যাওনি?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না। দেখি এক কাপ লেবু চা দাও তো।'

'স্যুয়েটার হাতে নিয়ে বসে আছ কেন?'

'পরতে ইচ্ছা করছে না। অঁস ফাঁস লাগছে।'

ফাতেমা খালা আদা চা বানিয়ে এসে দেখেন খালু সাহেব কাত হয়ে চেয়ারে পরে আছেন। ক্রীম কালারের স্যুয়েটারটা তার পায়ের কাছে পরে আছে। প্রথম দেখায় তার মনে হল— মানুষটা বৃষ্টি ঝরতে হয়ে য়ুমুচ্ছে।

আমি সকাল বেলাতেই খবর পেলাম — ঠিক করলাম একটু রাত করে খালাকে দেখতে যাব। সন্ধ্যার মধ্যে চিংকার, কান্নাকাটি খেমে যাওয়ার কথা। যে বাড়িতে মানুষ মারা যায় সে বাড়িতে মৃত্যুর আট থেকে ন'ঘন্টা পর একটা শান্তি শান্তি ভাব চলে আসে। আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করে চোখের পানির ঝরক ফুরিয়ে ফেলে। চেষ্টা করেও তখন কান্না আসে না। তবে বাড়ির সবার মধ্যে দুঃখী দুঃখী ভাব থাকে। সবাই সচেতনভাবেই হোক বা অসচেতনভাবেই হোক — দেখাবার চেষ্টা করে মৃত্যুতে সে-ই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে। মূল দুঃখের চেয়ে অভিনয়ের দুঃখই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র ব্যতিক্রম সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের দুঃখ। যে বাড়িতে মায়ের কোন সন্তান মারা যায় সে বাড়িতে আমি কখনই যাই না। সন্তান শোকে কাতর মায়ের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হিমুদের দেয়া হয়নি।

আমি রাত ন'টার দিকে ফাতেমা খালার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বাড়ি ভর্তি মানুষ। ফাতেমা খালা নাকি এর মধ্যে কয়েকবার অজ্ঞান হয়েছেন। এখন একটু সুস্থ। ডাক্তার রিপোর্টেন খেয়ে অধিকার ঘরে শুয়ে থাকতে বসেছে। তিনি তাঁর শোবার ঘরে শুয়ে আছেন। সেই ঘরে কারোর যাবার হুকুম নেই।

হুকুম ছাড়াই আমি শোবার ঘরে ঢুকে গেলাম। খালা আমাকে দেখে বেঁটকির মত শব্দ তুলে বললেন, 'হিমু রে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল রে। লেবু চা খেতে চেয়েছিল — বুঝলি। ঘরে লেবু ছিল না বলে আদা চা বানিয়ে নিয়ে দিয়ে দেখি এই অবস্থা। নড়ে না, চড়ে না, চেয়ারে কাত হয়ে আছে। মানুষটার শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হল না। সামান্য লেবু চা, তাও খেতে পারল না।'

'ঘরে লেবু ছিল না?'

'বুঝলি হিমু, আসলে ছিল। পরে আমি ফ্রিজের দরজা খুলে দেখি ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ানো চার-পাঁচটা কাপজি লেবু।'

'ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ানো কেন?'

'কাজের মেয়েটা যে আছে জাহেদার মা— সে কি যে বোকা তুই চিন্তাও করতে পারবি না। তাকে একবার বলেছিলাম, পান ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ে রাখতে। এর পর থেকে সে করে কি, যা-ই পায় ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ে রাখে।'

খালা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসলেন। আমি এখন স্বস্তি বোধ করছি। খালাকে মৃত্যুশোক থেকে বের করে কাজের মেয়ের সমস্যায় এনে ফেলে দেয়া হয়েছে।

'হিমু শোন, এই মেয়েটা আমাকে যে কি যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে তুই কখনও করতে পারবি না। মাঝে-মাঝে ইচ্ছা করে ওর গায়ে এসিড ঢেলে দেই।'

'সে কি?'

'তোমার খালু মারা গেছে সকাল দশটায়। এগারোটা থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। আর তখন জাহেদার মা শুরু করেছে কান্না। আছাড় পিছাড় কান্না। বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে যায় এমন অবস্থা। আমি তাকে আড়ালে ভেঙে নিয়ে বললাম, স্বর্গদার, চোখের পানি, চিংকার সব বন্ধ। আরেকটা চিংকার যদি করিস গলা টিপে মেরে ফেলব।'

'কেন?'

'আরে বুঝিস না কেন — তার কান্নাকাটি দেখে লোকজন ভাববে না — বাড়ির বুয়া এত কাঁদে কেন? রহস্যটা কি? তার উপর মেয়েটা দেখতে ভাল। শরীর স্বাস্থ্যও ভাল। ভারী বুক, ভারী কোমর। মাথার চুলও লম্বা। চলে গোগনে

শোপনে শ্যাম্পু দেয়। আমার শ্যাম্পুর বোতল ফাঁক করে দেয়। এত সাজগোজ লোকজন উষ্টাপাশটা ভাবতে পারে না?’

‘তা তো পারেই!’

‘এইসব কথা তো কাউকে বলতেও পারি না। তুই এসেছিস, তোকে বলে মনটা হালকা হল। চা খাবি?’

‘না!’

‘খা এক কাপ চা। তোর সঙ্গে আমিও খাই। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমি তো আর এই অবস্থায় চা দিতে বলতে পারি না। সবাই বলবে স্বামীর লাশ কবরে নামিয়েই চা কফি খেয়ে বিবিয়ানা করছে। ভাঙ্গা দরজারও ছিটকিনি আছে। মানুষের মুখের তো আর ছিটকিনি নেই। তুই যা, চায়ের কথা বলে আয়।’

‘চা খেতে খেতে খালা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। কোথায় শোক, কোথায় কি? সব জলে ভেসে গেল।’

‘বুঝলি হিমু, তোর সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে। তুই যে কোন কথা সহজভাবে নিতে পারিস, বেশির ভাগ মানুষ তা পারে না। একটা সাধারণ কথার দর্শটা বাঁকা অর্থ বের করে। এখন থেকে তুই আমাকে পরামর্শ দিবি, বুঝলি। তোর পরামর্শ আমার দরকার।’

‘কি পরামর্শ?’

‘তোর খামু মেলা টাকা রেখে গেছে। বিলি ব্যবহার ব্যাপার আছে।’

‘কত রেখে গেছেন?’

‘পুরোপুরি জানি না। আশা করত পারছি। ভয়ে আমার হাত-পা পেটে ঢুকে যাচ্ছেরে হিমু!’

‘কেন?’

‘টাকাওয়ালা মানুষের দিকে সবার নজর। তাছাড়া আমি মেয়েমানুষ। তোর খালুর আত্মীয়-স্বজনরা এখন সব উদয় হবে। মড়া কান্না কঁদতে কঁদতে আসবে। তারপর সুযোগ বুঝে হায়েনার মত খুবলে ধরবে।’

‘তুমি বড় হায়েনা হয়ে হাথা করে এমন হাসি দেবে যে হাসি শুনে ওরা পালাবার পথ পাবে না।’

‘রসিকতা করিস না। সব দিন রসিকতা করা যায় না। এই বাড়িতে আজ একটা মানুষ মারা গেছে—এটা মনে রাখিস। এখনো কবরে নামেনি। আছা শোন—কুশখানির একটা ভাল আয়োজন করা দরকার না?’

‘অবশ্যই দরকার। এমন ঝাওয়া আমরা খাওয়াবে যে সবার পেটে অসুখ হয়ে যাবে। পরের এক সপ্তাহ ওরসালানই খেতে হবে।’

‘না খালা গম্বীর গলায় বললেন, ‘হিমু, তুই আবার ফাজলামি শুরু করেছিস। কোকে অসহ্য লাগছে। একটা মৃত মানুষের জন্যে তোর সমান থাকবে না? তুই কি অমানুষ?’

‘ঠিক জানি না খালা। আমি কি তা পরে সবাই মিলে ঠিক করলেই হবে। আপাতত এসো কুশখানির মেনু ঠিক করি। তুমি কি খেতে চাও?’

‘আমি কি খেতে চাই মানে? ফাজিল বেশি হয়েছিস। ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস? আমার সঙ্গে রসিকতা। তুই এফুনি বিদেয় হ। এই মুহুর্তে।’

‘চলে যাব?’

‘খালা রাগে জ্বলতে জ্বলতে বললেন, ‘অবশ্যই চলে যাবি। আমি কি খেতে চাই জিজ্ঞেস করতে তোর মুখে বাধল না? শোন হিমু, আর কোনদিন তুই এ বাড়িতে আসবি না।’

‘আমি খুবই সহজভাবে বললাম, ‘তুমি ডাকলেও আসব না?’

‘খালা ভীত গলায় বললেন, ‘না, আসবি না। তোর জন্যে এ বাড়ির দরজা বন্ধ। হাবার মত বসে আছিস কেন? চলে যেতে বললাম, চলে যা।’

‘আমি চলে এলাম। খালা আর ডাকলেন না, আমিও গেলাম না।’

‘দু’ বছর হয়ে গেল। ফাতেমা খালা কীটায় কীটায় দু’ বছর পর তেকে পাঠিয়েছেন। আমি আবারো যাচ্ছি। তার মধ্যে কি পরিবর্তন দেখব কে জানে। ম্যানেজার সাহেবকে দেবে শর্কিত বোধ করছি। মনে হচ্ছে বড় ধরনের পরিবর্তন দেবতে পাব। কে জানে, হয়ত দেখব শাড়ি ফেলে দিয়ে স্কার্ট টপ ধরেছেন। চুল বব করিয়ে ফেলেছেন। মাথার সাদা চুলে আগে মেসি দিচ্ছেন। এখন সম্ভবত ব্লিচ করছেন।

‘ম্যানেজার সাহেব।’

‘জ্বি!’

‘ফাতেমা খালা—আপনার ম্যাজাম আছেন কেমন?’

‘ভাল আছেন। গ্যাসের প্রবলেম হচ্ছে, চিকিৎসার জন্যে শিগগিরই সিন্সাপুর যাবেন।’

‘গ্যাসের প্রবলেম মানে কি? পেটে গ্যাস হচ্ছে?’

‘জ্বি!’

‘খুবই দুঃসংবাদ। মেয়েদের পেটে গ্যাস একেবারেই মানায় না। গ্যাসের জন্যে সিন্সাপুর যেতে হচ্ছে?’



'গ্যাসটাকে তুচ্ছ করে দেখবেন না। গ্যাসের প্রবলেম থেকে অন্যান্য মেজর প্রবলেম দেখা দেয়। গ্যাস বেশি হলে উপরের দিকে ফুসফুসের ডায়াফ্রামে চাপ দেয়, হার্টের ফালাপানে ইস্টারফেয়ার করে।'

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, 'ভাই আপনি তো মনে হচ্ছে জ্ঞানী ম্যানেজার। ডাক্তারীও জানেন।'

ভদ্রলোক আমার রসিকতা পছন্দ করলেন না। গভীর হয়ে গেলেন। সারা পথে তার সঙ্গে আমার আর কোন কথাবার্তা হল না। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম— ম্যানেজার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'গাড়িতে এসি চলছে। সিগারেট ফেলে দিন।'

আমি বড়ই সুবোধ ছেলে হয়ে গেলাম। সিগারেট ফেলে দিলাম।

ফাতোমা খালাকে দেখে আমি ছোটখাট একটা চমক খেলাম। স্মার্ট টপ না, তিনি সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজই পরে আছেন। সাধারণ মনে বেশ সাধারণ — সুতি শাড়ি। হালকা সবুজ রঙে সাদা সুতার কাজ করা। তার পরেও তাঁকে দেখে চমকাবার কারণ হচ্ছে তাঁকে খুকী খুকী দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমে গেছে। মুখ হাসি হাসি। পান খেয়েছেন বলে ঠোঁট লাল হয়ে আছে। সারা শরীরে সুখী সুখী ভাব। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

খালা বললেন, 'হা করে কি দেখলি?'

'তোমাকে দেখছি। তোমার ব্যাপারটা কি?'

'কি ব্যাপার জানতে চাস?'

'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'কেমন দেখাচ্ছে?'

'খুকী খুকী দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমিয়ে ফেলেছে।'

'ফাজলামি করিস না হিমু!'

'ফাজলামি করছি না। আমার এই হলুদ পাঞ্জাবীর শপথ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স কুড়ি বছর কমেছে।'

'একটু আগে তো বললি দশ বছর কমেছে।'

'তরুণত দশ বছর মনে হচ্ছিল — এখন মনে হচ্ছে কুড়ি। ব্যাপারটা কি?'

খালা আনন্দিত গলায় বললেন, 'ফুড হেবিট চেঞ্জ করেছি। এখন এক বেলা ভাত খাই। শুধু রাতে। তাও পান্ডা খানিক খাই না, চায়ের কাপের এক কাপ ভাত। আতপ চানের ভাত। দিনে শাকসব্জি, ফলমূল খাই। সেই সঙ্গে ভিটামিন।'

'কি ভিটামিন?'

ভিটামিন ই। এটি এজিং ভিটামিন। খুব কাজের। ভিটামিন ই ক্রীম পাওয়া যায়। ঐ ক্রীম মুখে মাখি। গুলশানে একটা হেলথ ক্লাবে ভর্তি হয়েছি। ফ্রী হ্যান্ড এক্সারসাইজ করি। এক্সারসাইজের পর সোয়ানা নেই। সোয়ানার পর আধঘন্টা সুইমিং করি। সোয়ানাটা শরীরে ফ্যাট কমানোর জন্যে খুব উপকারী।'

'সোয়ানাটা কি?'

'স্ট্রিম বাথ। দশ-পনেরো মিনিট স্ট্রিম বাথ নিলে শরীর পুরোপুরি রিলাক্সড হয়ে যায়। টেনশান কমে। সুস্থ থাকার প্রধান রহস্য টেনশান ফ্রী থাকা।'

'সোয়ানা-সুয়ানা নিয়ে তুমি যে টেনশান ফ্রী হয়েছ এটা তোমাকে দেখে বোকা যাচ্ছে এবং খুবই ভাল লাগছে। তোমাকে মায়াবতী লাগছে। তবে তোমার ম্যানেজার বলছিল তুমি নাকি মায়াবতীর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসোবতী হয়েছ। গ্যাস হেডে আসার জন্যে সিঙ্গাপুর যাচ্ছ।'

খালা গভীর গলায় বললেন, 'গ্যাসোবতী হয়েছি মানে — কি ধরনের কথা বলছিল। গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মান রেখে কথা বলবি না? আমি তোরা খালা না? আমি কি তোরা ইয়ার-বান্ধবী?'

'অবশ্যই তুমি আমার খালা। ধনবতী খালা। আমাকে ডেকেছ কেন বল?'

'তাড়াছড়া করছিস কেন? বলব। তোকে খুব জরুরী কাজে ডেকেছি। গুছিয়ে না বললে তুই বুঝবি না। সময় নিয়ে বলতে হবে। তুই তো একেবারে কাকের মত হয়ে গেছিস, খুব রোদে রোদে ঘুরিস?'

'হুঁ ঘুরি।'

'আজকের জন্যে ঘোরাবুরি বাদ দে। বাড়িটা নতুন করে ঠিকঠাক করেছি। ঘুরে ফিরে দেখ, মজা পাবি। সপ্তাহখানিক পরে এলে সোয়ানা পাবি। আর্কিটেক্টকে ডেকে সোয়ানা বানাতে বলে দিয়েছি। রোজ রোজ গুলশানে গিয়ে পোষায় না।'

'ভাল করছে।'

'সোয়ানাটা বানানো হলে তোরা যখন ইচ্ছা করে সোয়ানা নিয়ে যাবি। দারোয়ানকে বলে দেব — আমি না থাকলেও ঢুকতে দেবে।'

'স্বাগতম হুঁ।'

'একটা সুইমিং পুল দেবার ইচ্ছা ছিল। আর্কিটেক্ট বলল, সম্ভব না। জায়গা নেই। ছাদের উপর যে করব সে উপায়ও নেই। সুইমিং পুলের লোড নেয়ার মত স্ট্রাকচারাল স্ট্রেন্থথ বাড়ির নেই।'

'নতুন বাড়ি করছ না কেন?'

'নতুন বাড়ি করার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। বাড়ি করা কোন ব্যাপার না। গুলশানে তোরা খাপু জায়গা কিনে রেখেছিলি। ডাবলাম কি দরকার পুরানো

বাড়িতে তো ভালই আছি। তাছাড়া তোর খালুর স্মৃতি এই বাড়িতে আছে। মানুষটা তো হারিয়েই গেল, তার স্মৃতিটা থাক। কি বলিস?’

‘ঠিকই বলছ।’

‘আমার ম্যানেজার কেমন দেখলি?’

‘সুটি পরা ম্যানেজার?’

‘আমিই বলেছি সুটি পরতে। স্মার্ট পাগে। পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা একটা লোকের কথায় মানুষ যতটা গুরুত্ব দেয় সুটি পরা মানুষের কথায় তারচে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়।’

‘মানুষটা কে তার উপরেও কিছুটা নির্ভর করে। নেংটি পরা মানুষের কথাও লোকজন খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনে, যদি মানুষটা হয় মহাশয় গান্ধী।’

‘ফালতু কথা বলিস না তো হিমু, মহাশয় গান্ধীকে আমি ম্যানেজার হিসেবে পাব কিভাবে? আমি যা পেয়েছি তাই ভাল। খুব চালাক চতুর ছেলে। মাছির মত চারদিকে চোখ। সব দেখছে। সমস্যা হলে নিজেই ডিভিশান নিচ্ছে, তেমন প্রয়োজন হলে আমাকে জানাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার বুঝতেই তো পারছিস।’

‘টাকা এখনো খরচ করে শেষ করতে পারনি?’

‘কি বলছিস তুই? তোর কি ধারণা, হাতে টাকা পেয়ে দুই হাতে উড়াচ্ছি? খুব ভুল ধারণা। খরচ তো অবশ্যই করছি। টাকা তো খরচের জন্যেই। ব্যাংকে জমা রেখে টাকার ডিম পাড়ানোর জন্যে না। তবে খরচ-টরচ করেও তোর খালু যা রেখে গেছে সেটাকেও বাড়িয়েছি। গুলশানের এত বড় জায়গা শুধু শুধু ফেলে রেখেছিল — রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছি। আমাকে চারটা ফ্ল্যাট দিচ্ছে, প্রায় এক কোটি টাকা ক্যাশ — বুলবুলই সব ব্যবস্থা করেছে।’

‘বুলবুল তোমার ম্যানেজার?’

‘হঁ, ভাল নাম রকিবুল ইসলাম। ডাকনাম বুলবুল। আমি বুলবুলই ডাকি।’

‘বুলবুল সাহেব তাহলে তোমার ডান হাত?’

‘তা বলতে পারিস — খুব গুস্তাদ ছেলে। হঠাৎ করে তোর খালুর এক আত্মীয় সেদিন বের হল, সং বোন। সম্পত্তির ভাগ নিয়ে হৈচৈ শুরু করল। ছোট আদালতে মামলাও করে দিল। বুলবুল তাকে এমন প্যাঁচে ফেললে যে তার চৌদ্দটা বেজে গেছে। এখন কেঁদে কুল পাচ্ছে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তামান্নাকে বললাম, বলে দাও আমার সঙ্গে দেখা হবে না। তারপরেও যাবে না। শুরু করেছে কান্নাকাটি। আমি তামান্নাকে বললাম, যেভাবে পার ঐ মহিলাকে বিদায় কর। একবার বলছি দেখা করব না — দেখা করব না।’

‘তামান্না আবার কে?’

‘ও আচ্ছা, তামান্নার কথা তো তোকে বলা হয়নি — আমার পি.এ। বুলবুল বেমন শক্ত, তামান্না তেমনি নরম। উঁচু গলায় কাউকে কোন কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব না। তুই তার সঙ্গে একটু কঠিন হয়ে কিছু বলবি ওম্মি দেখবি মেয়ের চোখ ছলছল করছে।’

‘তামান্নাকে দেখছি না তো!’

‘দেখবি। আজ রোববার তো, গুর আসতে দেবি হবে। রোববার সে তার সংসারের জন্যে বাজার করে। সংসার মানে তাই-বোন, মা-বাবার সংসার। তামান্না বিয়ে করেনি। বিয়ে করবেই বা কিভাবে? যাড়ে এত বড় সংসার। যাই হোক, ওকে নিয়ে আর তোকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে।’

‘আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, ‘এই জন্যে তুমি আমাকে আনিয়েছ?’

‘খালু হাসিমুখে বললেন, ‘তোকে আনিয়েছি অন্য কারণে। সেটা এখন না, পরে বলব। তার সঙ্গে তামান্নার সম্পর্ক নেই। যাই হোক, তুই তামান্নাকে দেখ। তার সঙ্গে কথাবার্তা বল। সারাজীবন পথে পথে ঘুরবি নাকি? হিমুগিরি তো অনেকদিন করলি, আর কত। ঘর-সংসার করবি না? মুসলমান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম না — সংসার ধর্মই আসল ধর্ম।’

‘মেয়েটা দেখতে কেমন?’

‘সাধারণ বাঙালি মেয়ের মত। সাধারণের চেয়ে একটু ডাউনও হতে পারে। তবু খুব বেশি ডাউন না। চলে। আর তুই নিজেও তো বাগদাদের রাজপুত্র না। চেহারা করেছিস কাকের মত, চাকরি নেই, কিছু নেই। কাকের মতই এটোকাটা ফুড়িয়ে থাকিস। যে মেয়ে তোকে বিয়ে করতে রাজি হবে বুঝতে হবে তার ব্রেনেই সমস্যা।’

‘তামান্না তো তাহলে রাজি হবে না।’

‘সেটা আমি দেখব। তুই একটা কাজ কর, হাত-মুখ ধুয়ে মোটামুটি স্বেদ ভাব ধরার চেষ্টা কর। এখনও খালি পায়ে থাকিস?’

‘হঁ।’

‘দাঁড়া, স্যান্ডেল কিনিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা শোন, এক কাজ কর, আমি বুলবুলকে বলে দিচ্ছি ও তোকে স্যান্ডেল কিনে দেবে। নাপিতের দোকান থেকে চুল কাটিয়ে আনবে। ভাল একটা পাঞ্জাবী কিনে দেবে। অসুবিধা আছে?’

‘কোন অসুবিধা নেই!’

‘খালু ম্যানেজারকে কি সব বললেন। নিচু গলায় বললেন, আমি কিছুই জ্ঞানাম না।’

ম্যানেজার সাহেব কর্মী মানুষ। তিনি প্রথমে আমার চুল কাটালেন। চুল কাটার সময় সামনে উপস্থিত থাকলেন এবং ক্রমাগত নাপিতকে ভিরেকশন দিতে লাগলেন— পেছনেরটা আরেকটু ছোট। সামনে বড়, ছুলফি আরেকটু রাখ। চুল কাটাকে মনে হচ্ছিল শিল্পকর্ম এবং তিনি একজন মহান শিল্পনির্দেশক। মাথার চুলে পথের পীচালী বানানো হচ্ছে এবং তিনি সত্যজিৎ রায়।

চুল কাটার পর শ্যাম্পু করা হল, হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানো হল। তারপর আমরা গেলাম স্যাভেল কিনতে। নিউ এলিফ্যান্ট রোড থেকে মেড ইন ইটালী স্যাভেল কিনলাম। মাথনের মত মোলায়েম স্যাভেল। স্যাভেল জোড়া যেন শুণ্ডণ করে গাইছে, 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে .....' পায়জামা পাঞ্জাবী কেনা হল। পাঞ্জাবীর উপর ফেলে রাখার জন্যে চাদর। সূতির চাদর তবে সুন্দর কাজ আছে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'চলুন, চশমা কিনে দেই।'

আমি বিম্বিত হয়ে বললাম, 'চশমা কেন? আমার তো চোখ খারাপ না।'

ম্যানেজার বিরক্ত মুখে বললেন, 'চোখ খারাপের চশমা না, গেটাপ চেঞ্জের চশমা। অনেক মানুষ আছে চশমা পরলে তাদের গেটাপে বিরাট পরিবর্তন হয়। যাদের চেহারায় মাথকি ভাব আছে — চশমা তাদের জন্যে মাষ্ট। মুখের অনেকখানি ঢেকে ফেলে।'

আমার চেহারায় মাথকি ভাব আছে তা জানতাম না। আমি শুধু বললাম, 'ও, আচ্ছা।'

'আপনি যেভাবে ও আচ্ছা বললেন তাতে মনে হল আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। কথা সত্যি। গলায় টাই পরলে মানুষকে এক রকম লাগে, আবার টাইয়ের বদলে কাঁখে চাদর ফেললে অন্য রকম লাগে। তেমনি চশমা পরলে লাগবে এক রকম, চশমা না পরলে লাগবে আরেক রকম। সুন্দর ফ্রেম দেখে জিরো পাওয়ারের একটা চশমা কিনে দি চলুন।'

'চলুন।'

আমি ভোল পাস্টে ফেললাম। চশমা পরলাম। পাঞ্জাবী বদলে নতুন পাঞ্জাবী পরলাম। ডেসিং রুম ছিল না বলে পায়জামা বদলানো গেল না। কাঁখে ফেললাম চাদর। ম্যানেজার সাহেব ফ্রিটিকের মত শুকনো গলায় বললেন, 'আপনাকে দেখতে ভাল লাগছে। বেশ ভাল লাগছে। গ্রেজেন্টেবল। শুধু চুল কাটাটা তেমন ভাল হয়নি। আজকালকার নাপিত চুল কাটতে জানে না।'

'চলুন আরেকবার কেটে আসি। মনে আফসোস রাখা ঠিক না।'

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'না থাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলুন যাই।'

বাড়ি ফিরলাম। আমাকে দেখে ফাতেমা খালা মুক্ত গলায় বললেন, 'আরে তোকে তো চেনা যাচ্ছে না। তোর চেহারা থেকে চামচিকা ভাবটা মোটামুটি চলে গেছে।'

আমি কদমবুটি করে ফেললাম। খালা বললেন, 'ওকি, সালাম করছিস কেন?'

'নতুন জামা-কাপড় পরেছি এই জন্যে। তামান্না কি এসেছে খালা?'

'না আচ্ছ আসবে না। ওর বাসায় সমস্যা হয়েছে। ওর ছোট ভাইটা রিকশা থেকে পরে সিরিয়াস ব্যথা পেয়েছে। তামান্না ওকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। পুরো পরিবারটা মেয়েটার ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে আছে। একা সে ক'দিক সামলাবে? দুর্গার মত তার তো আর চারটা হাত না, দুটা মোটে হাত।'

'খালা আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে — এত ঝামেলা করে গেটাপ চেঞ্জ করা হল, কোন কাজে লাগল না। তামান্নার সঙ্গে দেখা হল না। এক কাজ করলে হয় না? ঠিকানা দাও বাসায় চলে যাই।'

'বাসায় গিয়ে কি করবি?'

'তামান্নাকে বলব, আমাকে ফাতেমা খালা পাঠিয়েছেন। আপনার ছোট ভাই রিকশা থেকে পরে ব্যথা পেয়েছে — ঐ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলেছেন। তামান্নার ছোট ভাইটার নাম কি খালা?'

'জমিদ।'

'জমিদানের বয়স কত?'

'পাঁচ বছর।'

'জমিদানের জন্যে বেবুন-টেলুন জাতীয় কোন পিফট নিয়ে গেলে কেমন হয় খালা?'

'তুই কি সত্যি যাবি?'

'অবশ্যই।'

'যাক, তোর মধ্যে কিছু চেঞ্জ তাহলে এসেছে। আমি তেবেছিলাম তুই আর বদলাবি না।'

'বাসার ঠিকানা দাও, রিকশা ভাড়া দাও ঘুরে আসি।'

'তামান্নার বাসায় উপস্থিত হওয়াটা বাড়াবাড়ি হবে। আমি ব্যবস্থা করব, তুই চিন্তা করিস না। যে জন্য তোকে ডেকে আনলাম সেটি তো বলা হল না।'

'কখন বলবে?'

'আয়, শোবার ঘরে আয় — বলি।'

ফাতেমা খালার শোয়ার ঘরে আমি বসে আছি। খালা খাটে, আমি খাটের

সঙ্গে লাগোয়া চেয়ারে। খালা কথা বলছেন ফিস্ফিস্ করে। দরজাও ভেজিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘর অধো অন্ধকার। কেমন ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ভাব। মিলিটারী কু যখন হয় তখন সম্ভবত জেনারেলরা এইভাবেই কথা বলেন।

'একজন লোককে তুই খুঁজে বের করবি। লোকটার নাম ইয়াকুব। বাবার নাম সোলায়মান মিয়া। বয়স পঞ্চাশের উপর। তার স্থায়ী ঠিকানা আমার কাছে নেই। ঢাকায় যেখানে থাকতো সেই ঠিকানা আছে— অতীশ দীপংকর রোড। সেখানে এখন নেই। ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিলাম। কোথায় গেছে তাও কেউ জানে না। তোর কাজ হচ্ছে ইয়াকুবকে খুঁজে বের করা। ঢোল পিটিয়ে খোঁজা যাবে না। চুপি চুপি খুঁজতে হবে।'

'তোমার ম্যানেজার যেখানে ফেল করেছে সেখানে আমি পাশ করব কিভাবে।'

'তুই পাশ করবি। তোর কাজই তো পথে পথে যোরা। আর ইয়াকুব লোকটা খুব সম্ভব পথে পথেই থাকে।'

'যদি পাই কি করব? কানে ধরে তোমার কাছে নিয়ে আসব?'

'আমার কাছে আনতে হবে না। খবর্দার আমার কাছে আনবি না। তুই তার সঙ্গে গল্পগুজব করবি।'

'ইয়াকুব সাহেবকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব, এই আমার কাজ?'

'হুঁ।'

'খালা আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কি ধরনের গল্পগুজব করব? দেশের রাজনীতি? হাসিনা-খালেদা সংবাদ?'

খালা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাঁড়া, তোকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলি। পুরো ঘটনা না শুনলে তুই গুরুত্বটা বুঝবি না। আমাকে কথা দে যে দ্বিতীয় কেউ জানবে না। কসম কাট।'

'কসম কাটছি কেউ জানবে না।'

'এইভাবে কেউ কসম কাটে? তোর কোন প্রিয় মানুষের নামে কসম কাট।'

'তামান্নার কসম। দ্বিতীয় কেউ জানবে না।'

খালা অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার সবকিছু নিয়ে ফাজলামিটা আমার অসহ্য লাগে। তোকে ধর দিয়ে আনাই ভুল হয়েছে। তামান্নার নামে কসম কাটাইস কোন হিসেবে? ও তোর অতি প্রিয়জন হয়ে গেল?'

'তুমিও আমার অতি প্রিয়। তোমার নামে কসম কাটব?'

'থাক কসম কাটতে হবে না। ঘটনাটা শোন — তোকে আগ্রাহর দোহাই

লাগে কেউ বেন না জানে।'

'কেউ জানবে না খালা। আপনি নিশ্চিত মনে বহুন।'

দরজা ভেজানোই ছিল। খালা উঠে গিয়ে লক করে দিলেন। এতেও তার মন ভাল না। তিনি আবার দরজা খুলে বাইরে উকি দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করলেন। চেয়ার টেনে আমার কাছে নিয়ে এলেন। গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন, 'তোমার খালুজান ছিল খুব বেষয়িক মানুষ। তার বিলি-বাবস্থা, হিসাব-নিকাশ খুব পরিষ্কার। তার মৃত্যুর পর টাকা-পয়সার কি করতে হবে না করতে হবে সব সে লিখে গেছে। উকিলকে দিয়ে সাক্ষি-সাবুদ দিয়ে উইল করে গেছে। সেই উইল ষাঁটতে গিয়ে দেখি সর্বনাশ— ইয়াকুব নামের এক লোককে সে মালীবাগের বাড়ি আর নগদ দশ লাখ টাকা দিয়ে গেছে।'

'সে কি, কেন?'

'আমারো তো সেটাই প্রশ্ন— কেন? তোর খালুজানের কাছে সারাজীবনে একবার তার নাম শুনলাম না কোথাকার কোন ইয়াকুব — তাকে বাড়ি আর দশ লাখ টাকা। তোর খালুর কি ভীমরতি হয়েছে।'

'ভীমরতি-ফতি খালুজানের হবে না।'

'ঠিক বলেছিস সে ঐ টাইপের না। টাকা যখন দিয়েছে তখন কোন কারণেই দিয়েছে।'

'এ লোককে খুঁজে বার করা তোমার জন্যে খুব বোকামি হবে। ও আসবে বাড়ি আর নগদ টাকা নিয়ে ডানিশ হয়ে যাবে। তিনি ভিডি ভিসি।'

'পাধার মত কথা বলিস না তো হিমু। বাড়ি আর টাকা নেয়া অত সহজ— আমি শুধু জানতে চাই তোর খালুজানের সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক কি ছিল? আমার ধারণা ফিস্ফাস কোন ব্যাপার?'

'ফিস্ফাস ব্যাপার মানে? ফিস্ফাসটা কি?'

'মেয়েখাট কিছু।'

'কিছুটা কি?'

'সেটা কি আর আমি জানি নাকি?'

'খালুজান যেমন মানুষ তাঁর তেমন ভীমরতি হওয়া সম্ভব না, তেমনি ফিস্ফাস হওয়াও সম্ভব না।'

'পুরুষ মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। পুরুষ জাতি বড়ই আক্রমণ জাতি।'

'তাহলে আমার কাজ হচ্ছে ইয়াকুবকে খুঁজে বের করে তার পেটের তেতর

থেকে গল্প টেনে বের করে নিয়ে আসা।’

‘হঁ। পারবি না?’

‘ইয়াকুব সাহেবকে খুঁজে বের করতে পারলে পারব।’

‘বুঝি হিমু, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে লোকটাকে পাওয়া যেত, কেন বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না— বুঝতেই পারছিস।’

‘তা পারছি।’

‘তুই এই উপকারটা আমার কর। লোকটাকে খুঁজে বের কর। আমি তোকে খুঁশি করে দেব।’

‘আচ্ছা।’

‘খুঁজে বের করতে পারবি না?’

‘মনে হয় পারব।’

‘কিভাবে খুঁজবি?’

‘রাস্তায় রাস্তায় হাঁটব— সন্দেহজনক কাউকে দেখলে জিজ্ঞেস করব, স্যার আপনার নাম কি ইয়াকুব? নাম যদি ইয়াকুব না হয় তাহলে আমার কোন কথা নেই। আর নাম যদি ইয়াকুব হয় তাহলে আমার একটা কথা আছে। কথাটা হচ্ছে আপনার পিতার নাম কি?’

‘হিমু।’

‘কি খালা?’

‘তুই তো মনে হয় আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছিস। তোকে ইয়ারকি করার জন্যে আমি ডাকিনি। আমি খুব ভাল করে জানি ইয়াকুব নামের লোকটাকে খুঁজে বের করা তোর কাছে কোন ব্যাপার না। ইচ্ছা করলে তুই তিন দিনের মাথায় লোকটাকে বের করে ফেলবি। এই জন্যেই তোকে ডাকিয়েছি।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে।’

‘তুই লোকটাকে খুঁজে বের কর। আমি কথা দিচ্ছি তোকে খুঁশি করে দেব।’

‘আমি তো সব সময় খুঁশি হয়েই আছি। তুমি এরচে বেশি খুঁশি কি করে করবে?’

‘বললাম তো তোকে খুঁশি করব। কিভাবে করব সেটা তখন দেখবি।’

‘আজ তাহলে বিদায় হই খালা?’

‘আচ্ছা যা।’

‘স্যাক্সেল চশমা এইসব রেখে যাই? তামান্নার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা যখন হবে তখন পরব। খালি পায়ে হেঁটে অভ্যাস হয়ে গেছে। স্যাক্সেল পায়ে পথে

নামলে হুমড়ি খেয়ে চলন্ত ট্রাকের সামনে পড়ে যেতে পারি। তেমন কিছু ঘটলে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান পাবে না। সেটা ঠিক হবে না।’

‘তোয় যা ইচ্ছা কর। তোর কথাবার্তা একনাগাড়ে শোনা অসম্ভব ব্যাপার। তুই যে কি বলিস না বলিস তা বোধহয় তোর নিজেদেরো জানা নেই।’

‘আমি স্যাক্সেল, চাদর, চশমা রেখে খালার বাড়ি থেকে বের হলাম। গেটের দারোয়ান সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আচ্ছা, এই দারোয়ানের নাম ইয়াকুব না তো? বাঘের ঘরে যোগের বাসা। অনুসন্ধান খালার বাড়ির গেট থেকেই শুরু হোক। দারোয়ানের বয়স চল্লিশের উপরে। কাজেই তাকে সন্দেহভাজনদের তালিকায় রাখা যেতে পারে। আমি ধমকে দাঁড়ালাম। দারোয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বললাম, ‘কে ইয়াকুব না? ইয়াকুব কেমন আছ? ভাল?’

‘দারোয়ান ধতমত খেয়ে বলল, ‘স্যার আমার নাম কলাম।’

‘ও আচ্ছা, কলাম তোমার চেহারা অবিকল ইয়াকুবের মত। সেই রকম নাক, সেই রকম মুখ। তোমার চোখও ইয়াকুবের মতই ট্যারা। ভাল কথা, ইয়াকুব নামে কাউকে চেন?’

‘জ্ঞানা।’

‘না চেনাই ভাল। ডেনজারাস লোক।’

‘আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুছি। দারোয়ানের বিষয় এখনো কাটছে না। সে তাকিয়ে আছে। আচ্ছা, বিশ্বয় নামক মানবিক আবেগ কত ধরনের হতে পারে? কি কারণে আমরা বিস্মিত হই?’

‘অন্যের বোকামি দেখে বিস্মিত হই।’

‘অন্যের বুদ্ধিমত্তা দেখেও বিস্মিত হই।’

‘এখানেও সমস্যা আছে। যে মহাবোকা সে অনৈর বোকামি দেখে বিস্মিত হবে না। সে সেটাই স্বাভাবিক ধরে নেবে। বিজ্ঞানীদের উচিত বিশ্বয় ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করা। বিশ্বয় মিটার জাতীয় যন্ত্র বের করে ফেলা। যে যন্ত্র মানুষের চোখের পলকে বিশ্বয় মেপে ফেলবে। বিশ্বয় মাপা হবে এক থেকে দশের মধ্যে। লগারিদমিক স্কেলে। দশ হবে বিশ্বয়ের সর্বশেষ সীমা। একজন মানুষের জীবনে মাত্র দু’বার বিশ্বয় মিটারের সর্বশেষ মাপ দশে উঠবে।’

‘প্রথমবার হবে যখন সে মায়ের গর্ত থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হবে। পৃথিবী দেখে বিশ্বয় দশ। আর শেষবার আবারো বিশ্বয় মিটারের মাপ দশ হবে যখন সে

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবে। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করবে, সে হতভয় হয়ে ভাববে— কি হতে যাচ্ছে? একি, আমি কোথায় যাচ্ছি?

যারা খুব ভাগ্যবান মানুষ তাদের কেউ কেউ এক জীবনে বিশ্বয় মিটার আরো এক দু'বার হয়ত দশ স্কোর করবেন। নেইল আর্মস্ট্রং যখন চাঁদে নামলেন তখন তিনি দশ স্কোর করলেন।

টমাস আলভা এডিসন ফনোগ্রাফ আবিষ্কার করলেন। এমন এক যন্ত্র যা মানুষের কথা বন্দি করে ফেলতে পারে। আসলেই তা পারে কিনা তা পরীক্ষার জন্যে নিজেই যন্ত্রের সামনে বসে বিভূবিড় করে একটা ছড়া বললেন —

Mary had a little lamb

Its fleece was as white as snow

And every where that Mary went

That lamb was sure to go.

ছড়া শেষ করে উত্তেজনায় কপালের ঘাম মুছলেন। তার গলার শব্দ আসলেই কি যন্ত্রটা বন্দি করতে পেরেছে? তিনি যন্ত্র চালু করলেন — যন্ত্রের ভেতর থেকে শব্দ আসতে লাগল —

Mary had a little lamb

সেদিন বিশ্বয় মিটার ফিট করে রাখলে টমাস আলভা এডিসনের বিশ্বয় দশ বা দশের কাছাকাছি হত।

আচ্ছা আমি এইসব কি ভাবছি? মূল দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান করতে হবে। বরশি ফেলে তার পেটের ভেতর থেকে কথা বের করে নিয়ে আসতে হবে।

পাজেরো একটা জীপ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জীপের মালিক বিরসমুখে বসে আছে। বিরসমুখের কারণ গাড়ির চাকার হাওয়া চলে গেছে। ডাইভার চাকা বদলাচ্ছে। আচ্ছা পাজেরোর মালিকের নাম কি ইয়াকুব হতে পারে না? আমি কেন ধরে নিচ্ছি ইয়াকুব লোকটা হবে হতদরিদ্র? সে বিত্তশালীও তো হতে পারে।

আমি ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে খানিকটা সন্দেহও আছে। পাজেরোর মালিকরা সবার দিকে খানিকটা সন্দেহ নিয়ে তাকান।

'স্যার কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম কি ইয়াকুব?'  
কোন জবাব আসছে না। আমি হাসিমুখে বললাম, 'স্যার আপনার যে ডাইভার তার নাম কি? বাই এনি চাল ইয়াকুব না তো? আমি ইয়াকুবের সন্ধানে বের হয়েছি। আমাকে একটু সাহায্য করুন।

I need your friend help.'

পাগলদের দিকে মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ভদ্রলোক সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এতক্ষণ তার চোখ ভর্তি ছিল সন্দেহ। এখন সেই সন্দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভয়। তিনি দ্রুত গাড়ির কাচ উঠাচ্ছেন। গাড়ির কাচে নাক চেপে ভদ্রলোককে ভেঙে কাটলে কেমনে হয়। ভয়ে তার নিশ্চয়ই পিঁপে চমকে যাবে। পাজেরোর মালিকরা ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে আমার মত নিরীহ পথচারীকে ভয় দেখান। কাজেই সুযোগ-মত তাদেরকেও ছোটখাট ভয় দেখাবার অধিকার আমার আছে। আমি গাড়ির কাচে নাক চেপে জিত বের করে সাপের মত এদিক-ওদিক করতে লাগলাম এবং ঘেঁষ ঘেঁষ জাতীয় শব্দ করতে লাগলাম। পাজেরো মালিক ভয়ে এবং আতঙ্কে কেমন জ্ঞানি হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মোবাইল ফোন নেই। থাকলে পুলিশকে খবর দিতেন।



ইয়াকুবের সন্ধানে যাওয়া শুরু হল। কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর থেকে বের হবার আলাদা আন্দন। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ছকুর দোকানে চা খেয়ে ফুটপাতে পা রাখা মাত্র নিজেকে কলধাসের মত মনে হল। একজন মানুষ, একটা মহাদেশের মত। মানুষকে আবিষ্কার এবং মহাদেশ আবিষ্কার একই ব্যাপার।

ফুটপাতে বিশাল এক পাথর।

পাথরে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার জেগাড়া হল। নিজেকে পতন থেকে অনেক কষ্টে সামলানো। ডান পায়ের নখ কেটে রক্ত বের হচ্ছে। দু' হাতে পায়ের নখ চেপে বসে পড়তেই কে একজন জিজ্ঞেস করল, ভাইজান, আইজ কত তারিখ?

তাকিয়ে দেখি পাথরটা থেকে পাঁচ হ' হাত দু'রে এক মধ্যম বয়সী ভিথিরী। তার একটা চোখ নষ্ট। ভাল চোখটা অতিরিক্ত ভাল। সেই চোখের পাতা ক্রমাগত পিট পিট করছে। দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। একচক্ষু ভিথিরীই তারিখ জানতে চাচ্ছে। তার মুখে চাপা হাসি। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা ব্যাপারটা দেখে সে মনে হয় মজা পেয়েছে। ভিথিরীদের জীবনে মজার অংশ কম। অন্যের দুঃখকষ্ট থেকে মজা আহরণ করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। আমি বললাম, 'এই পাথরটা কি তুমি এখানে রেখে দিয়েছ?'

ভিথিরী গভীর গলায় বলল, রাখলে অসুবিধা কি?

'না কোন অসুবিধা নেই। তুমি রেখেছ কিনা সেটা বল।'

'ই' রাখছি।'

'প্রতিদিনই লোকজন এখানে ধাক্কা খাচ্ছে?'

'বেথিয়ালে হাঁটলে ধাক্কা খাইবই।'

'আজ সারাদিন ক'জন ধাক্কা খেয়েছে?'

'অত হিসাব নাই।'

'আমিই কি প্রথম?'

৩৪

'কি না — আফনে পরথম না।'

'নাম কি তোমার?'

'আমার নাম মিয়া আফনের কি দরকার?'

'কোন দরকার নেই, তারপরেও জানতে চাচ্ছি। তুমি যেমন কারণ ছাড়াই জানতে চাচ্ছিলে আজ কত তারিখ? আমিও সে রকম জানতে চাচ্ছি।'

'আমার নাম মেহকান্দর মিয়া। বাড়ি বরিশাল নবীনগর।'

'ভিক্ষা শেষ করে যখন বাড়িতে ফিরে যাও তখন পাথরটা কি কর, সঙ্গে করে নিয়ে যাও?'

'আমি পাথর নিমু ক্যান? পাথর কি আমার?'

'সারাদিনে তোমার রোজগার কত হয়?'

'এক জাগত ভিক্ষা করি বইলা রোজগার কম। হাঁটাইটিতে রোজগার বেশি।'

'হাঁটাইটি কর না কেন?'

'ইচ্ছা করে না। সামান্য দুইটা পয়সার জন্যে অত খাটনি ভাল লাগে না।

কারোর ইচ্ছা হইলে দিব। ইচ্ছা না হইলে নাই। আমি কি আফনের কাছে ভিক্ষা চাইছি?'

না।

'আফনের কাছে যেমন ভিক্ষা চাই না, অন্যের কাছেও চাই না।'

'শুধু তারিখ জানতে চাও?'

'ই?'

মেহকান্দর মিয়া তার খুলির তেতর কি মেন খোঁজাখুঁজি করছে। এর খুলিও অন্যের খুলির মত। শান্তিনিকেতনী কাপড়ের ব্যাগ। মেহকান্দর মিয়া বিড়ি বের করল। মুখে দিতে দিতে বলল, ফকির দুই কিসিমের আছে — ভিক্ষা চাওইন্যা ফকির। ভিক্ষা না চাওইন্যা ফকির। আমি হইলাম না চাওইন্যা।

'ভাল কোনটা, চাওইন্যাটা, না না চাওইন্যাটা?'

'ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে।'

নখ থেকে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। আমি উঠে দাঁড়লাম। রক্ত পড়ছে পড়ুক।

ভিক্ষুক আবারো বলল, 'স্যার তারিখ কত জানেন?'

আমি বললাম, 'জানি না। মনে করার চেষ্টা করছি। যদি মনে পড়ে তোমাকে আনিয়া যাব। আর শোন, পাথরটাকে যত্নে রেখো, এটা সাধারণ পাথর না। এই পাথর রহস্যময়।'

৩৫

মেহকান্দর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর আমি ভাবছি আজকের তারিখটা যেন কত? ফাতেমা খালার সঙ্গে সেবা হবার পর সাতদিন কি কেটে গেছে? আজকে কি ষষ্ঠ দিবস, না সপ্তম দিবস?

ঘরে তারিখ ভুলে গেলে দেয়ালে ক্যালেন্ডার দেখা যায় — পথে ক্যালেন্ডার খুলে না। নগরকর্তারা ধরে নেন যারা পথে নামে তারা তারিখ জেনেই নামে। এ জন্যেই শহরের মোড়ে মোড়ে ক্যালেন্ডার খুলে না।

ইদানীং দাশা শহর অনেক উন্নত হয়েছে — একটা পরপর দোকান সাজিয়ে চেঙা ছেলেপুলে বসে আছে — আইএসডি টেলিফোন, দেশ-বিদেশে ফোন, ফ্যাক্স। এদের ব্যবসাও রমরমা; বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে টেলিফোন করতে ভালবাসে।

ধাই ধাই করে যে দেশ এগুচ্ছে সে দেশের পথে পথে ক্যালেন্ডার থাকা দরকার। কাউকে কি জিজ্ঞেস করব আজ তারিখ কত? ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করা সহজ। আজ কত তারিখ — জিজ্ঞেস করা খুব সহজ না। পরিচিত প্রশ্নের জবাব আমার অগ্রহ করে দেই। অপরিচিত প্রশ্নের জবাব দিতে থমকে যাই। ভুরু কুঁচকে ভাবি লোকটা এই প্রশ্ন করল কেন? সে তারিখ জানতে চায় কেন? রহস্যটা কি?

রাস্তার পাশে চিত্তিত মুখে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বোধহয় অফিসে যাবার সময়। বেবীটেলি দেখা মাত্র হাত উঁচু করছেন এবং এই বেবী এই বেবী করে চেঁচাচ্ছেন। আমি তার পাশে দাঁড়লাম এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার আজ কত তারিখ?

যা ভেবেছিলাম তাই, ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। এমনভাবে তাকালেন যেন আমি ভয়ংকর কোন মতলব নিয়ে তার কাছে এসেছি। শুকতে ভাল মানুষের মত তারিখ জানতে চাচ্ছি, তারপরই নিচু গলায় ফিস্ফিসু করে বলল, মানিব্যাগ বের করুন। আপসে মানিব্যাগ আমার হাতে দিয়ে চলে যান। নো সাউভ গ্লীজ। আমি ভদ্রলোককে আরো ভৎসে দিলাম। মহা বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, এলেকজিউজ মি স্যার। আপনার নাম কি ইয়াকুব?

ভদ্রলোক কোন কিছু না বলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। আজ মনে হয় তিনি বেবীটেলি নেনেন না। হেঁটেই অফিসে যাবেন। ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছনে ফিরলেন। ওলি আমি হাসলাম। হেসে তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটা শুরু করলাম। ভদ্রলোক তাঁর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। আমিও বাড়িয়ে দিলাম। তিনি এখন প্রায় দৌড়াচ্ছেন। ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সামান্য সাহায্য করছি; পরোপকার বলা যেতে পারে।

আজ্ঞা নগরীর মানুষ কি বদলে যাচ্ছে? তারা এত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে কেন? সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। আপনার নাম কি ইয়াকুব? এই নির্দেশ

৩৬

বলে জাতকে অস্থির হওয়ার মানে কি? আপনার নাম কি গোলাম আযম? এই প্রশ্নে শব্দিত হওয়া যায়। এমন প্রশ্ন তো করছি না।

সামনের ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল। তিনি খালি বেবীটেলি পেয়ে প্রায় লাফিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে গেছেন। বেবীটেলির পেছনের জানালা দিয়ে কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখছেন। তার চোখ থেকে ভয় এখনো কাটেনি। আমি টা-টা, বাই-বাই ভঙ্গিতে হাত নাড়লাম। তিনি চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অফিসে ফিরে এই ভদ্রলোক আজ রোমহর্ষক সব গল্প শুরু করবেন। তার সহকর্মীরা চোখ বড় বড় করে গল্প শুনবে —

'ভয়ংকর এক বদমাশের পাল্লায় পড়েছিলাম। অম্বের জন্যে জীবনটা রক্ষা পেয়েছি। বেবীটেলির জন্যে অপেক্ষা করছি — হঠাৎ দেখি হলুদ পাঞ্জাবী পরা এক লোক এগিয়ে আসছে। তার একটা হাত পাঞ্জাবীর পকেটে। সে যখন আমার পানে এসে দাঁড়াল, তখন বুঝলাম তার হাতে পিস্তল। মদ খেয়ে এসেছে। মুখ দিয়ে শুক শুক করে মদের গন্ধ আসছে। আমাকে বলল, 'তুমি ইয়াকুব?'

আমি বললাম, 'কি না।'

সে বলল, 'মিথ্যা কথা বলছিস কেন? তোরা নাম ইয়াকুব?' আমি হতভয়।

কি বলব বা কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে বলল, 'কোন কথা না, আমার সঙ্গে গাড়িতে ওঠ। কুইক। নো সাউভ!'

আমি তাকিয়ে দেখি রাস্তার পাশে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। মাইক্রোবাসে ছয় জন বসে আছে। তাদের গায়েও হলুদ পাঞ্জাবী। সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার হাত-পা জমে গেল। আমি কোনমতে বললাম, 'আপনি ডুল করছেন ....।'

শ্রোতারা হতভয় হয়ে গল্প শুনবে। তারা যতই হতভয় হবে, গল্পের ডালপালা ততই ছড়াবে এবং একটা সময় আসবে যখন এই ভদ্রলোক নিজেই নিজের গল্প বিশ্বাস করতে শুরু করবেন। তিনি যদি লেখক হন তাহলে তার আত্মজীবনীতে এই গল্প স্থান পাবে।

ফাতেমা খালার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাঁকে জানানো দরকার যে প্রজন্ম ইয়াকুবের কাজকর্ম পূর্ণ উদ্যাম চলছে। অনুসন্ধান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই চলছে। ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মেহকান্দর মিয়াও দিয়ে অনুসন্ধানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাফল্য দ্বারপ্রান্তে। টেলিফোন কোথেকে করব বুঝতে পারছি না। সন্দেহ করবেই যে কার্ড ফোনে কথা বলব। টেলিফোনের দোকান খুলে যারা বসে আছে তাদের কাছে গেলে লাভ হবে না। তাদের হচ্ছে 'ফেল কড়ি মাখ তেল' ব্যাপার। মাগীবাগে আমার একটা টেলিফোনের বাকির দোকান

৩৭

আছে। সেখানে আমার নামে খাতা আছে। খাতায় নাম লিখে টেলিফোন করতে হয়। কল শেষ হবার পর দোকানের মালিক জগন্নাথ ভাই বিরস গলায় বলেন— 'টাকা তো অনেক জমে গেল হিমু সাহেব। কিছু অস্তুত ক্রিয়ার করেন। আজ না পারলেও এই সপ্তাহের মধ্যে কিছু দিতে পারেন কিনা দেখেন। চা খাবেন?'

আমার টেলিফোনের এই ব্যক্তির দোকানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে টেলিফোন শেষ হবার পর চা পাওয়া যায়। এক কাপ না, যত কাপ ইচ্ছা। দুপুরে গেলে জগন্নাথ ভাই জোর করে ভাত খাইয়ে দেন। রাতে বিপদে পড়লে যুমুবার ব্যবস্থাও আছে। জগন্নাথ ভাই রাতে দোকানে থাকেন। শোকমের পেছনে বড় ঘর আছে। সেই ঘরের সবটা জুড়ে খাট পাড়া। রাতে উপস্থিত হলে তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বলেন— 'কি ব্যাপার রাতে থাকবেন? বালিশ নেই, কোলবালিশ মাথায় নিচে দিয়ে ঘুমুতে হবে। আর শুনুন, নাক ডাকাবেন না। আমি সব সহ্য করতে পারি, নাক ডাকা সহ্য করতে পারি না।'

জগন্নাথ ভাইয়ের দোকান থেকে ফাতেমা খালাকে টেলিফোন করলাম। ভারী গভীর পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল— কে কথা বলছেন? ফাতেমা খালার ম্যানেজার। আমি বললাম, 'বুলবুল নাকি? ভাল?'

'কে, হিমু সাহেব?'

'ছি!'

'দয়া করে আমাকে কখনো বুলবুল ডাকবেন না। বুলবুল আমার ডাকনাম। আমার ভাল নাম রুকিবুল। আমি ডাকনামে পরিচিত হতে চাই না। আমি পরিচিত হতে চাই ভাল নামে।'

'মহাকবি শেখপীরার নাম প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছিলাম— গোলাপকে ভূমি যে নামেই ডাক সে গরু ছড়াবে।'

'দয়া করে আমার সঙ্গে শেখপীরার কপচাবেন না। এবং আমাকে কখনো বুলবুল ডাকবেন না।'

'আমার যদি কোনদিন খালার মত কোটি কোটি টাকা হয় তাহলে কি আপনাকে বুলবুল ডাকতে পারব?'

'আপনি কি ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'ছি!'

'ধরুন দিচ্ছি। ম্যাডামের শরীরটা বেশি ভাল না। ডাক্তার তাকে মোটামুটি রেপ্টে থাকতে বলেছেন। কাজেই টেলিফোনে আপনি বেশিক্ষণ কথা বলবেন না।'

'কি আছে। রাদার শুনুন, আজ কত তারিখ বলতে পারবেন?'

'তারিখ দিয়ে আপনি কি করবেন? তারিখ তো আপনার কোন কাজে আসার কথা না।'

'আমার জন্যে না। একজন ভিবিবী আমার কাছে তারিখ জানতে চাচ্ছিল। ভিবিবীর নাম মেহকান্দর মিয়া।'

'আজ ১৭ তারিখ। উনিশশো অষ্টআশি সাল। আপনি ধরে থাকুন। আমি ম্যাডামকে দিচ্ছি।'

খালা এসে টেলিফোন ধরলেন। চিট গলায় বললেন, 'কে হিমু? আমি মারা যাচ্ছি।'

'কি হয়েছে?'

'ঘুম হচ্ছে না। সারারাত জেগে থাকি।'

'সেকি!'

'সূর্য উঠার পর ঘুম আসে। তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাই। তাও খুব অল্পক্ষণ— ম্যাঞ্জিমাম দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা।'

'দুই আড়াই ঘণ্টাই যথেষ্ট। নেপোলিয়ান তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাতেন না।'

'গাখার মত কথা বলিস না, আমি কি নেপোলিয়ান?'

'অব্যয়ই নেপোলিয়ান— মেয়ে মানুষ হয়ে এত বড় ব্যবসা দেখছ। তুমি কম কি? নেপোলিয়ানকে এই ব্যবসা দেখতে দেয়া হলে সে এক সপ্তাহের মধ্যে লাল বাতি জ্বালিয়ে সব ছেড়ে দূরে আসামের দিকে চলে যেত।'

'তোমার কথাবার্তার ধরন আর পন্ডাল না। ইয়াকুবের খোজ বের করেছিস?'

'কাজ চলছে। শিগগিরই জানতে পারবে।'

'লোকটাকে বের করতে পারলে তোকে আমি ক্যাশ বৃড়ি হাজার টাকা দেব।'

'টাকাটা আলাদা করে রাখা খালা— আমি দু'একদিনের মধ্যে আসামী হাজির করছি।'

'আরে পাধা, তোকে কি বলেছি আসামী হাজির করতে হবে না। শুধু পেট থেকে কথা বের করবি।'

'নো প্রবলেম।'

'তাহলে টেলিফোন রেখে দেই। কথা বলতে পারছি না। মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। অসম্ভব যন্ত্রণা।'

'জামান কেমন আছে খালা।'

'জামান কেমন আছে মানে? জামানটা কে?'



‘ঐ যে তামান্নার ছোট ভাই —রিকশা থেকে পড়ে পায়ের ব্যথা পেল। আমি ঠিক করে রেখেছি কুড়ি হাজার টাকা পেলে ছেলেটাকে একটা লেগো সেট উপহার দেব। জমানের বোন ভাল আছে তো?’

‘তামান্নার কথা বলছিন?’

‘হাঁ’

‘আশ্চর্য, এখনো তোর মাথায় তামান্না আছে? আমি তো ভেবেছি সব ভুলে বসে আছি। তোর যা নেচার। তোকে তো আমি আজ থেকে চিনি না। যাই হোক, তুই তামান্নার ব্যাপারে ভাবিস না। আমি সব ব্যবস্থা করব। আমি তামান্নাকে কিছু হিটস দিয়েছি। সরাসরি তোর কথা বলিনি— ঘুরিয়ে বসেছি। ও দেখি খুবই লজ্জা পাচ্ছে।’

‘অতিরিক্ত লজ্জার জন্যে আবার পিছিয়ে পড়বে না তো?’

‘পিছিয়ে যাবে কোথায় — আমি এমন চাল চালব।’

‘খালা থাকেন।’

‘তোমার পরিবর্তন দেখে আমি খুবই অবাক হচ্ছি। শোন হিমু, তোর জীবনটা আমি বদলে দেব। আমার ফার্মে তোকে চাকরি দেব।’

‘সুট-টাই পরতে হবে?’

‘পরতে হলে পরবি। সুট-টাই কি খারাপ? তোর হলুদ পাঞ্জাবীর চেয়ে ভাল।’

‘তোমার মাথায় যন্ত্রণা এখন একটু কম না?’

‘হ্যাঁ কম। সকালে তো মাথা ভুলতে পারছিলাম না এমন অবস্থা। তুই ইয়াকুবের খেঁজ পেলেই আমাকে জানাবি। আমি ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম থেকে ডেকে তুলবি।’

‘আচ্ছা, খালা একটা কথা — ইয়াকুব লোকটা দেখতে কেমন তা কি জান? মোটা না রোগা, লম্বা না বেটো?’

‘কিছুই জানি না।’

‘না জানলেও অসুবিধা নেই। দু’একদিনের মধ্যেই জানা যাবে লোকটা কেমন। আজও জানা যেতে পারে। কুড়ি হাজার টাকা কাশ দিয়ে খালা। ক্রশভ চেক দিলে বিরাট সমস্যা হবে। আমার ব্যাংকে একাউন্ট নেই।’

একটা টেলিফোন করলে খালে পড়ার সম্ভাবনা। আমি আবার সীতার জানি না। কাজেই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় টেলিফোন করলাম। তামান্নার ব্যাপারটা রূপাকে জানানো দরকার। আজকাল রূপাকে টেলিফোনে ধরা সমস্যা হয়েছে। প্রথম একজন কাজের লোক টেলিফোন ধরে। তার কাছে নাম ঠিকানা দিতে হয়।

অনেকক্ষণ টেলিফোনের রিসিভার কানে নিয়ে বসে থাকার পর দ্বিতীয় একজন টেলিফোন ধরে। তার কাছে দ্বিতীয় দফা নাম ঠিকানা দিতে হয়। সে বায়োডাটা পুরোটা শোনার পর বলে, ধরেন দেখি আপা বাসায় আছে কিনা। খুব সম্ভব নই।

আজ্ঞো তাই হল। ফার্স্ট রাউন্ড শেষ করে আমি সেকেন্ড রাউন্ডে উঠলাম। পুরুষ কণ্ঠ বলল, কার সঙ্গে কথা বলবেন রূপা আপনার সঙ্গে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, স্ত্রি।

‘আপনার নাম?’

‘আমার নাম মেহকান্দর?’

‘কি বললেন? কি কান্দর?’

‘মেহকান্দর।’

‘আপনার পরিচয়?’

‘আমি ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এজ্জাজুল কবীর সাহেবের পিএ। ধর্মমন্ত্রী আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। বিশেষ প্রয়োজন।’

‘লাইনে থাকুন দিচ্ছি।’

‘একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। জোহরের নামাজের টাইম হয়ে গেছে মন্ত্রী সাহেব নামাজে দাঁড়বেন।’

‘স্ত্রি দিচ্ছি।’

‘একটা সেকেন্ড। আপনার নাম তো ইয়াকুব তাই না?’

ভদ্রলোক হতভম্ব গলায় বললেন, স্ত্রি। আপনি কি করে জানেন।

আমি হাই তেলার মত শব্দ করতে করতে বললাম, আমাদের সব খৌজ-খবর রাখতে হয়। ছুমার নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাপার কি?

টেলিফোনের ওপাশ থেকে বিড় বিড় জাতীয় শব্দ হচ্ছে। ইয়াকুব সাহেবের বিষয় আকাশ স্পর্শ করেছে।

‘স্যার একটু ধরেন আপাকে দিচ্ছি।’

‘চার কলমা জানেন?’

‘প্রথমটা শুধু জানি।’

‘চারটা কলমাই শিখে রাখবেন। পরে আবার ধরব।’

‘স্ত্রি আচ্ছা।’

রূপা টেলিফোন ধরেই বলল, কে হিমু?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

‘সবার সঙ্গে তামাশা কর কেন? ইয়াকুবকে উন্টাপাটা কথা বলছ কেন?’

'উন্টাপাটা কথা তো কিছু বলছি না। চার কশমা মুকুত করতে বলেছি।'  
 'ওর নামই বা জানলে কিভাবে?'  
 'আদায়ে টিল খুঁড়ছি। টিল লেগে গেছে। আজকাল যে কোন লোকের সঙ্গে কথা হলে প্রথমেই জানতে চাই— তার নাম কি ইয়াকুব? কেন জানতে চাই বলব?'  
 'নিশ্চয়ই উদ্ভট কোন কারণ আছে। আমি এখন আর উদ্ভট কিছু শুনতে আশ্বহী না। তোমার উদ্ভট আচার-আচরণ এক সময় ভাল লাগতো। একটা বয়স থাকে যখন বিহাস্ত হতে ভাল লাগে। সেই বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। হিমু শোন, আমার বয়স তোমার মত একটা জায়গায় স্থির হয়ে নেই। আমার বয়স বাড়ছে।'  
 'আমারো বয়স বাড়ছে। আমি এখন আর আগের হিমু না। পরিবর্তিত হিমু।'  
 'তাই বুঝি?'  
 'হ্যাঁ তাই। এখন আমার মধ্যে পাখিদের স্বভাব দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা হলে পাখিদের মত ঘরে ফিরে আসি। গত দু'টা পূর্ণিমায় আমি ঘর থেকে বের হইনি।'  
 'আস্বা।'  
 'ওধু তাই না, আমি ঠিক করেছি বিয়ের কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে। মেয়েটার নাম ভামান্না। নাম সুন্দর না?'  
 'হ্যাঁ, নাম সুন্দর।'  
 'চেহারা ছবি তেমন না। বেশ খানিকটা ডাউন। তা আমার মত ছেলেকে ডাউন মেয়েরাই তো বিয়ে করবে। আর মেয়েরা কেন করবে?'  
 'তাও ঠিক।'  
 'ভাবছি ভামান্নাকে নিয়ে একদিন তোমার বাসায় যাব।'  
 'প্রীজ দয়া করে এই কাজটি করবে না। তোমার কোন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমি নিজেদের জড়াতে চাচ্ছি না। এবং আমি খুব খুশী হব যদি তুমি ঐ মেয়েটিকে আর বিহাস্ত না কর।'  
 'তুমি তুল করছ রূপ। আমি ভামান্নাকে মোটেই বিহাস্ত করছি না। বরং সেই আমাকে বিহাস্ত করছে।'  
 'হিমু আমি এখন রাধি। আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার শরীর ভাল না, ছুর। গারে রাশের মত হয়েছে।'  
 'দেখতে আসব?'  
 'না। আমি কেন?'  
 'রূপা খুব সহজভাবেই টেলিফোন নামিয়ে রাখল।'

আমি টেলিফোন রেখে জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মধুর ভাবিতে হাসলাম। জগলু ভাই বললেন, হিমু সাহেব কিছু পেমেট করবেন না। আপনার তো মেলা জমে গেল। একটা একটা করে বালি জমে মরুভূমি হয়ে যায়। আমি আনন্দিত গলায় বললাম, মরুভূমি বলেই মরুদ্যানের খোঁজ থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে সব ক্রিয়ার করে দেব। কুড়ি হাজার টাকা পাছি।  
 'চা খাবেন?'  
 'চা তো খাবই। ভাল কথা, আপনার কর্মচারীদের মধ্যে ইয়াকুব নামে কেউ আছে?'  
 'ছিল।'  
 'তাদের আর্থীয়-স্বজনদের মধ্যে ইয়াকুব নামে কেউ আছে?'  
 'জানি না, খোঁজ নিয়ে দেখব।'  
 'ভাল কার খোঁজ নেবেন। আপনার মুখ এমন শুকনো কেন? শরীর ভাল।'  
 'কি শরীর ভাল।'  
 'মন খারাপ?'  
 'হঁ মন খারাপ। খুবই খারাপ।'  
 'ব্যবসা হচ্ছে না?'  
 'না।'  
 'জগলু ভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, বাবা কিছু ক্যাশ রেখে গিয়েছিল বলে ভেঙ্গে খাচ্ছি। ক্যাশ শেষ হলে কি হবে জানি না। আপনার মত হুন্দু পাঞ্জাবী পরে পথে পথে ঘুরতে হবে। ভাগ্য, বুঝলেন হিমু ভাই, সবই ভাগ্য।'  
 'জগলু ভাই বিমর্ষমুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। জগলু ভাইয়ের দোকানের নাম সুরমা স্টেশনারী। রাস্তার মোড়ে বেশ বড় দোকান। জিনিসপত্র ভালই আছে। দোকানটা দেখতেও সুন্দর। দু'জন কর্মচারী আছে। সুদর্শন, কথাবার্তায় ভদ্র। অথচ এই দোকানে কোন কাষ্টমার আসে না। আসলেই আসে না। জগলু ভাই এর আগে কলাবাগানে একটা দোকান দিয়েছিলেন— সাগর স্টোর। সেখানেও একই অবস্থা। আশপাশে সব দোকানে ভাল বিক্রি— সাগর স্টোরে মাছিও উড়ে না যে কর্মচারীরা মাছি মারবে। জগলু ভাই দোকানের জায়গা বদলালেন, নাম বদলালেন। আগে যে কর্মচারী ছিল তাকেও বদলালেন। কোন লাভ হল না। এখানেও এই অবস্থা। সব দোকানে রমরমা ব্যবসা— তারটা ফাঁকা।'  
 'হিমু সাহেব!'  
 'ছিল।'

'ভাগ্যটা কেমন জিনিস দেখলেন? আমি সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি, চা খাই আর মনে মনে ভাগ্য কি সেটা ভাবি। কেন আমার দোকানে লোক আসবে না? আমি জিনিসের দাম বেশি রাখি না, কাষ্টমারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি। তারপরেও এই অবস্থা কেন? বড় ধরনের পীর-ফকির পেলে ডেকে জিজ্ঞেস করতাম। আপনার সন্ধানে কোন পীর-ফকির থাকলে নিয়ে আসবেন। উনার দোয়াতে যদি কিছু হয়। খরচপাতি যা লাগে আমি দিব। কথাটা মনে রাখবেন হিমু সাহেব।'

'কি মনে রাখব।'

'চা কি আরেক কাপ খাবেন?'

'কি না। আজ উঠি, কাজ আছে।'

'বসেন গল্প করি। চুপচাপ বসে থাকি — কথা বলার মানুষ নাই।'

'আরেক দিন এসে গল্প করব। আমার প্রচুর কাজ —একটা লোকের সন্ধানে করছি। নাম ইয়াকুব।'

'ওধু নাম দিয়ে লোক খুঁজে বের করে ফেলবেন? এক কোটি লোক থাকে ঢাকা শহরে।'

'আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, চেঁচা করে দেখি।'

'দুপুরে চলে আসুন। আজ খিচুড়ি রাঁধতে বলেছি। আমার কাজের ছেলেরা ভাত-মাছ রাঁধতে পারে না, খিচুড়ি পোলাও এইসব ভাল রাঁধে।'

'দেখি সময় পেলে চলে আসব।'

আমি আবারো পথে নামলাম। পায়ের তাক্সা নখ কষ্ট দিচ্ছে। মানুষের দু'টা অংশ শরীর এবং মন। মন অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে। শরীর কেন পারে না? শরীরের বয়স বাড়ে। মনের বাড়ে না। জুড়া শরীরকে ধাস করতে পারে। মনকে পারে না। শরীরের মৃত্যু আছে মনের কি অবস্থা? যে মন জড়াকে জয় করতে পারে সে নিশ্চয়ই মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। এই জাতীয় দার্শনিক চিন্তা করতে করতে এগুছি।

রাস্তায় প্রচুর মানুষ। তাদের ব্যস্ততাও দেখার মত। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বসে যে চা খাচ্ছে সেও ব্যস্ত। স্থির হয়ে চা খাচ্ছে না, সারাক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এদের মধ্যেই নুকিয়ে আছে রহস্যময় ইয়াকুব।

ঢাকা শহরের মানুষদের ঠিকঠাক পরিসংখ্যান থাকলে দেখা যেত এই শহরে মোট কতজন ইয়াকুব আছে। তিন থেকে পাঁচ হাজার থাকার কথা। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই অসম্ভব বিত্তবান। কেউ হতদরিদ্র। দু'একজন পাওয়া যাবে সাধু সন্ত —মহাপুরুষ পর্যায়ে, কয়েকজন নিশ্চয়ই ভয়ংকর অপরাধী—

খুনটুন করে ফেলেছে। কিছু থাকবে রেপিস্ট। ন'দশ বছরের বালিকা রেপ করে নুকিয়ে আছে।

ঢাকা শহরের সব ক'টা ইয়াকুবকে একত্র করে একটা গ্রুপ ছবি তুলতে পারলে ভাল হত। এদের নিয়ে গবেষণার্থী একটা বইও লেখা যেত —

A comprehensive study in the lives of  
Yakub's of  
Dhaka city.

বাংলায়—'ঢাকা শহরের ইয়াকুবদের জীবন চর্চা।' না বাংলা নামটা ভাল লাগছে না। গবেষণার্থী বইয়ের নাম ইংরেজীতেই ভাল খুলে।

পরম লাগছে। শীতকালের রোদ খুব কড়া হয়। রোদটা জামা-কাপড় ভেদ করে চামড়ার ভেতর ঢুকে পড়ে। রোদ থেকে ছায়াতে গেলেই লাগে ঠান্ডা। শীতকাল হল এমন এক কাল যে কালে রোদেও থাকা যায় না, ছায়াতেও থাকা যায় না।

আমি ভিক্ষুক মেহকান্দর মিয়ার সন্ধানে বের হলাম। আজ সতেরো তারিখ এই ষষ্ঠি তাকে জানানো দরকার। বেচারী তারিখ জানতে চাচ্ছিল। যে পাথর আমাকে ব্যথা দিয়েছে তাকেও দেখে আসতে ইচ্ছা করছে। জগৎ অতি রহস্যময়। কে জানে একদিন হয়ত বৈজ্ঞানিকরা বের করে ফেলবেন জড় পদার্থেরও মন আছে। তাদের জীবনেও আছে আনন্দবেদনার কথা। আমার বাবা তার জবাবদা খাতায় লিখে গেছেন

"মহাপ্রাণ নানান ভঙ্গিতে নিজেই প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষ হিসেবে নিজেই প্রকাশ করেছেন, পশু কীটপতঙ্গ হিসেবেও নিজেই প্রকাশ করেছেন। গাছপালাও মহাপ্রাণেরই অংশ। নদী, সাগর, বালি ধূলিকণাতেও তিনি নিজেই প্রকাশিত করেছেন। বিশ্বরক্ষণের সকলই মহাপ্রাণের নানান রূপান্তর।"

আমার পিতার কথা সত্যি হলে পাথরেরও প্রাণ থাকবে। যেহেতু সে পাথর তার প্রাণ হবে কোমল। সে মানুষকে ব্যথা দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু নিজে সেই কারণে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছে।



'কে হিমু না?'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। পায়ের পাতা গরমে চিড়চিড় করছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি ভয়াবহ ব্যাপার। শীতকাল এখনো শেষ হয়নি। অথচ দিনের বেলায় চৈত্র মাসের গরম পড়ছে। আলনিদের এফেট হবে। রাস্তার পিচ এখনো গলা শুরু করেনি। তবে মনে হচ্ছে করবে। ভরদুপুর হলেও কথা ছিল। বেশা চারটার মত বাজে। বিকেল শুরু হয়েছে। এখনো এত গরম।

'কথা বলছিস না কেন? তুই হিমু না?'

আমি বলতে মাঙ্খিলাম— 'কি না। রং নাথায়।'

বলা হল না। এমন তো হতে পারে যে প্রশ্ন করছে— তাকেই আমি খুঁজছি। তার নামই ইয়াকুব। বাবার নাম সোলায়মান। আমার অনুসন্ধানের অন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গড় অলমাইটি তাকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি প্রমুখর্তার দিকে তাকালাম। প্রমুখর্তা মিডিয়াম সাইজ পর্বতের কাছাকাছি। টকটকে লাল শার্ট গায়ে দিয়ে আছেন। তাঁর বিশাল তুরী শার্ট হিঁড়ে যে কোন মুহূর্তে বের হয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে। মাথা পরিষ্কার করে কামানো। বেথটি পরিয়ে ছেড়ে দিলে জাপানী সুমো কুস্তিগীর হয়ে যাবে। জাপানীদের সঙ্গে চেয়ারার খানিকটা মিলও আছে। নাক চ্যাটা। চোখ ছোট ছোট। এর নাম ইয়াকুব হবার কোন কারণ নেই।

প্রমুখর্তা আহত গলায় বলল, মাই ভিয়ার ওস্ত ফ্রেণ্ড, তুই কি এখনো আমাকে চিনতে পারছিস না?

আমি বললাম, না এখনো চিনতে পারিনি। তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুই আছিস কেন দেশ? শরীরটা তো মাশাল্লাহ্ ভাল বানিয়েছিস।

প্রমুখর্তা বিব্রণ গলায় বলল, কেউ আমাকে চিনতে পারে না। তাদের দোষ দিয়ে কি হবে। আমি নিজেই নিজেই চিনি না। তোর সঙ্গে কিশোরী মোহন পাঠশালায় পড়তাম। আমি আরিফ। আরিফুল আলম জোয়ার্দার। এখনো চিনতে পারিসনি?

৪৬

'হুঁ বাচ্চি।'

'আমার এক চাচী ছিলেন পেটে সন্তান এলেই তিনি মাটি বেতেন। মাটির ছলার তিনটা মাথা ভেঙ্গে একদিন খেয়ে ফেললেন। সেদিন রান্না হল না। রীধবে কোথায়? ছলা নেই। চাচীর শাওড়ি চাচীর উপর খুব রাগ করল—বৌমা এতই যদি মাটি খেতে হয়—ক্ষেতে চলে যাক। ক্ষেতে গিয়ে মাটি খাও। আমি চোখের আড়াল হলে তুমি দেখি বাড়ির সব খেয়ে ফেলবে। তাদের আবার মাটির ঘর-বাড়ি তো, এই জন্মে চিটাটা বেশি।'

আমি হো হো করে হাসছি। বড় হয়ে ব্যাঙাচি যে এমন রসিক হবে তা বোঝা যায়নি। ছোটবেলায় তার প্রতিভা বেকিতে 'ইয়ে' করে দেবার ব্যাপারেই শীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাঙাচি ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে রে দেশ। তুই যখন জড়িয়ে ধরলি তখন প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম। দেখা হলে জড়িয়ে ধরার মত বন্ধ মানুষের এক দু'টার বেশি থাকে না। আর কোথাও বসে চা-টা কিছু খাই। ভাল কথা, চাকরি-বাকরি কিছু করছিস?

'পার্ট টাইম চাকরি।'

'পার্ট টাইম চাকরি তাল রে দেশ। টেনশান কম। কাজটা কি? বেতন কত? বেতন কম হলে বলিস না। তোকে লজ্জা দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করিনি। পুরানো বন্ধু সেই দাবিতে জিজ্ঞেস করা।'

'অনুসন্ধানের কাজ। একটা লোককে খুঁজে বের করা। খুঁজে বের করতে পারলে কুড়ি হাজার টাকা পাব। খুঁজে না পেলে লবডঙ্গা।'

'দেশ তিতা করিস না। আমি তোকে সাহায্য করব। ওয়ার্ড অব অনার। পুরানো বন্ধুর জন্যে এইটুকু না করলে কি হয়। তাছাড়া আমার কাজকর্মও কিছু নেই। আয় কোথাও বসে চা-টা কিছু খাই। ফর ওস্ত টাইম সেক। তোর সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে?'

'না। আমার গাঞ্জাবীর পকেট নেই।'

'এটা ভাল করেছিস। পকেটই ফেলে দিয়েছিস। টাকা আমার কাছেও নেই। বউ টাকা দেয় না। টাকা দিলেই খাওয়া-দাওয়া করব এই জন্যে দেয় না। সে যেমন বুনে ওল আমিও তেমন বাঘা তেতুল। আমিও ব্যাঙাচি—ঢাকা শহরে তিনটা জায়গায় ব্যবস্থা করা আছে। বাকিতে খাই, মাসকাবারি টাকা দেই। চল আমার সঙ্গে একটু হাঁটতে হবে। পারবি না?'

'দরব।'

৪৮

'না।'

'চেনা চেনা কি লাগছে? না তাও লাগছে না?'

'তাও লাগছে না। অবশ্য শুরুতে ভেবেছিলাম— তুই ইয়াকুব।'

'ইয়াকুব কে?'

'ইয়াকুব হল সোলায়মানের ছেলে।'

'সোলায়মানটা কে?'

'বাব দে, চিনতে পারবি না। কেমন আছিস বল?'

'দোস্ত সত্যি করে বল তুই এখনো আমাকে চিনতে পারছিস না?'

'না।'

'চিনতে না পারলে এমন অন্তরিকতাবে কথা বলছিস কেন?'

'তুই অন্তরিকতাবে কথা বলছিস দেখে আমিও বলছি।'

আরিফুল আলম জোয়ার্দার গলা নিচু করে বলল, ক্লাস ফোরে পড়ার সময় একদিন বেকিতে 'ইয়ে' করেছিলাম। যার জন্যে টিফিনের সময় ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। অংক স্যার আমাকে ডাকতেন— 'ব্যাঙাচি।'

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি, ব্যাঙাচির এই অবস্থা?

ইউনিভার্সিটির পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে মুখ হাসি হাসি করে স্মিগ্লেস করা হয়— 'তারপর কি খবর ভাল আছেন? এখন কি করছেন?' কলেজের পুরানো বন্ধুর সঙ্গে বলা হয়— 'আরে তুমি? কেনন আছ? আর ফুল লেভেলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে— একজন আরেকজনের উপর কাঁপিয়ে পড়ে— তাই নিম্ন।'

আমি ব্যাঙাচির উপর কাঁপ দেব কি দেব না ভাবছি। বেচারী যেভাবে করণ চোখে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে আমার কাঁপের অপেক্ষা করছে। কাঁপ দেয়াই মনস্থ করলাম।

দু'হাতেও তাকে ঠিক জড়িয়ে ধরা গেল না। ব্যাঙাচি ধরা গলায় বলল, দেশত গরমের মধ্যে জড়া জড়ি করিস না ছাড়। শরীর ভর্তি চর্বি। জড়া জড়ি করলে অসুস্থি লাগে।

আমি বললাম, লাগক অসুস্থি। তোকে ছাড়ব না। তুই এমন মটু হয়েছিস কি তাবে?

'খেয়ে খেয়ে মটু হয়েছি দেশ। দিন-রাত খাই।'

'বলিস কি?'

'কেন খাব না বল— আল্লাহপাক মানুষকে খাওয়ার জন্যেই তো সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মানুষের খাদ্যদ্রব্য। গরু-মাইষ, ছাগল-ভেড়া, পোক-মাকড়, গাছ-গাছড়া সবই তো আমরা খাচ্ছি। খাচ্ছি না?'

৪৭

'তোকে দেখে এমন ভাল লাগছে দোস্ত। আবার খারাপও লাগছে। খালি পায়ের হাঁটুতে দেখে মনে বাধা পেয়েছি। আই এ্যাম হার্ট। ভিক্ষা করে যে ফকির সেও স্পঞ্জের স্যাভেল পায়ে দেয়। আর তুই হাঁটুতে খালি পায়ের? তুই কোন চিন্তা করিস না—তোকে আমি ভাল এক জোড়া স্যাভেল কিনে দেব। প্রমিস। টাকা থাকলে আঙ্কই কিনে দিতাম। জুতার দোকানে বাঁধি দেয় না।'

ব্যাঙাচি আমাকে নিয়ে মালীবাগের এক কাবাব হাউসে ঢুকল। পিয়া কাবাব এর বিরানী হাউস। সাইনবোর্ডে রোগা পটকা এক খালির ছবি। খালির মুখটা হাসি হাসি। হাস্যমুখী ছাগল যে পেইন্টার একেছে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী হাসতে পারে না বলে যে ধারণা প্রচলিত তা যে সম্পূর্ণ ভুল হাস্যমুখী ছাগল দেখে তা বোঝা যায়।

'দোস্ত কি খাবি? যা খেতে হচ্ছে করে যা। এটা বলতে গেলে আমার নিজেরই দোকান। মালিক আমার ভাগ্নে। আপন না, পাতানো। আপন ভাগ্নের চেয়ে পাতানো ভাগ্নের জোর বেশি তাতো জানিসই। জানিনা? বিরানী খাবি?'

'বিকাল বেলা বিরানী খাব?'

'বাসি বিরানী। এর টেষ্ট আলাদা। গরম করে দিবে, নাশতার মত যা। বিরানী যত বাসি হয় তত স্বাদ হয়— ঘি ভেতরে ঢুকে। মাসে নরম হয়। মাংসের প্রত্যেকটা আঁশ আলাদা আলাদা হয়ে যায়। আমার কথা শুনে আজ খেয়ে দেখ। একবার খেলে আর টাটকা পোশাকও খেতে পারবি না। শুধু বাসি পোশাক খাবি।'

খাওয়ার মত স্থল ব্যাপারও যে এত দুঃস্বপ্নন হতে পারে ভাবিনি। আরিফ বাচ্ছে, আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। মনে হচ্ছে পোলাওয়ার প্রতিটি দানার স্বাদ সে আলাদা করে পাচ্ছে। হাড়ি চুষছে। আনন্দে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খাওয়ার মাঝখানে একটা আন্ত পেঁয়াজ নিয়ে কচকচ করে চিবিয়ে ফেলল। গাঢ় স্বরে বলল, পেঁয়াজের রস হজমের সহায়ক। ভরপট বিরানী খাবার পর দু'টা মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ চিবিয়ে খেয়ে ফেলবি দেখবি আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার ক্ষিপে পোয়েছে। আমার অবশ্য হজমের সমস্যা নেই।

বিরানী পর্ব তিন গ্রেট। আর ছিল না। শেষ হবার পর এক বাটি সুপের মত তরল পদার্থ এল। সুপের উপর গুলমরিচের গুঁড়া ভালছে। কুচিকুচি করে কাটা কাঁচা মরিচ ভালছে। আরিফ বাটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। সুপের বাটির দিকে এমন মুগ্ধ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে এর আগের কি কেউ তাকিয়েছে? মনে হয় না।

আমি বললাম, জিনিসটা কি?

আরিফ গাঢ় স্বরে বলল, কান্দি-রসা।

হিমু-৪

৪৯

'কাচ্চি-রসা মানে? এই নাম তো আপে কখনো শুনিনি।'  
'শুনবি কি করে? আমার দেয়া নাম — অসাধারণ একটা জিনিস — কাচ্চি বিরিয়ানীর তেল। চুইয়ে চুইয়ে পাতিলের নিচে জমা হয়। হাই খোঁটিন। খেতে অমৃত। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, সেও এক ইতিহাস। শুনবি?'

'কল শুনি।'

'কিসমত নামে পুরানো ঢাকায় একটা রেইক্রেট আছে। সেখানে বিরানী খাচ্ছি হঠাৎ দেখি বাবুর্চি পাতিল থেকে তেল নিংড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম খেয়ে দেখি জিনিসটা কেমন। খায়াপ হবার কথা তো না, ঘি প্রাস গোশতের নির্ধাস, প্রাস পোলাওয়ের চালের নির্ধাস। এক চামচ মুখে দিয়ে বিশ্বাস কর দেখ আমার কলজা ঠান্ডা হয়ে গেল। সেই থেকে নিয়মিত খাচ্ছি। চেখে দেখবি একটু?'

'না'

'থাক, রোগা পেটে সহ্য হবে না।'

ব্যাঙাচি গভীর তৃপ্তিতে কাচ্চি-রসার বাটিতে চুমুক দিল। লম্বা চুমুক না, ধীর লয়ের চুমুক। যেন প্রতিটি বিন্দুর স্বাদ আলাদা আলাদাভাবে নিচ্ছে। তার চোখ বন্ধ। মাথা সামান্য দুলছে। যেন কোন সংগীত রসিক বিধোভেনের ফিফথ সিমফনী শুনছে।

আরিফ হঠাৎ চোখ খুলে গোপন কোন সংবাদ দেবার মত করে বলল, মিরপুরে বিহারীদের একটা দোকান আছে। খাসির চাপ বানায়। এমন চাপ বেহেশতের বাবুর্চিও বানাতে পারবে না। তোকে একদিন নিয়ে যাব। আজই নিয়ে যেতাম ওরা আবার থাকিতে দেয় না। কি কি সব মশলা দিয়ে চাপটাকে চার পাঁচ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখে। তারপর ডোবা তেলে ভাজে। মশলার মধ্যেই কারিগরি।

'খাওয়া-দাওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে তুই কথা বলিস না?'

'বলব না কেন? বলি তবে বলতে ভাল লাগে না। খাওয়ার জন্যে মরতে বসেছি। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। শরীর ভর্তি চর্বি, হাই ব্লাড প্রেসার, হাই কোলেস্টেরল, লিভার ড্যামেজড। ফ্যাটি লিভার। কিডনীর সমস্যা। হয়ত আর বছরখানিক বাঁচব। যার জন্যে মরতে বসলাম তারে নিয়েই কথা বলি। কাচ্চি রসা খেয়েছি—এখন তার এফেক্ট কি হয় দেখ— ডাকিয়ে থাক আমার দিকে।'

আমি ডাকিয়ে আছি। ব্যাঙাচি ঘামতে শুরু করেছে। ফেঁটা ফেঁটা ঘাম না, বৃষ্টির ধারার মত ঘাম নেমে আসছে। একটা বড় ফ্লোর ফ্যান তার দিকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। পাখা ফুল স্পীডে ঘুরছে। ব্যাঙাচি রক্ত গলায় বলল, 'এই রকম ঘাম চলবে আধ ঘন্টার মত। তারপর শরীর নেতিয়ে যাবে। তখন ঘন্টাখানিক

শুয়ে থাকতে হবে। তুই চলে যা—এদের এখানে বিছানা আছে। আমি শুয়ে থাকব।'

'চলে যাব?'

'অবশ্যই চলে যাবি। এই নে কার্ডটা রেখে দে। বাসার ঠিকানা আছে। সন্ধ্যার পর চলে আসিস। তোকে স্যাভেল কিনে দেব। আমার হাতে তো এরা টাকা-পয়সা দেয় না। তোর ভাবীকে বলব স্যাভেল কিনে দিতে। তুই খালি পায়ের হাঁটুখিস দেখে খুবই মনে কষ্ট পেয়েছি। ক্লাসের কত অগা-মগা-বগা কোটিপতি হয়ে গেল আর তুই খালি পায়ের হাঁটুখাঁটি করছিস।'

'তুই কথা বলিস না, চুপ করে থাক। কথা বলতে তোর কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট তো হচ্ছেই। তোর কোন কার্ড আছে?'

'না।'

'জিঙ্কস করাই ভুল হয়েছে। খালি পায়ের হাঁটে তার আবার কার্ড কি। হাই হোক, আমারটা রেখে দে। সন্ধ্যার পর বাসায় চলে আসবি। দারোয়ান চুকতে না দিলে কার্ড দেখাবি। স্টেইট আমার কাছে নিয়ে যাবে। দারোয়ানকে বলা আছে। অপরিচিতদের মধ্যে যারা আমার কার্ড দেখাবে শুধু তাকেই চুকতে দেবে।'

'তুই কি খুব মালদার পাটি না-কি?'

'কার্ডটা দেখ। কার্ড দেখলেই বুঝবি। আর দেখ শোন, তোকে আমি সাহায্য করব। ওয়ার্ড অব অনার। ঐ লোককে বুঝে বের করব।'

ব্যাঙাচির ঘাম আরো বেড়ে গেল। তাকে ওই অবস্থায় রেখে আমি চলে এলাম। হাতে ব্যাঙাচির কার্ড। হেভশেকের বদলে কার্ডশেক। কিছুদিন পর কার্ড কাগচাচরের আরো উল্লুতি হবে বলে আমার ধারণা। কার্ডে সরকারী বিধিনিষেধ এসে পড়বে। সাধারণ জনগণ ব্যবহার করবে সাদা রঙের কার্ড, সংসদের সদস্যরা লাল পাসপোর্টের মত লাল কার্ড, কোটিপতিদের কার্ড হবে সোনালি, লক্ষপতিদের রূপালী—। ফকির-মিসকিনদের কার্ডের রঙ হবে ছাই রঙের। তাদের কার্ডে প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকবে। যেমন—

মেহকান্দর মিয়া	
ভিক্ষুক	
পিতা :	কুতুব আলি
এক চক্ষু বিশিষ্ট (কানা)	
ব্যবসায়ের স্থান:	রামপুরা টিভি ভবন হইতে মৌচাক গোলচত্বর
ট্রেড মার্ক :	গোল পাথর
সরকারী রেজিস্ট্রেশন নম্বর:	৭১৯৬৩৩০২/ক

সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষুক মেহকান্দর মিয়র অবস্থানের জায়গাটার পেলাম।  
মেহকান্দর আমাকে দেখে বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাল। আমি মধুর গলায়  
বললাম, 'কেমন আছ মেহকান্দর?'

সে জবাব দিল না। পিচ করে থুথু ফেলল। থুথু পড়ল পাথরটার উপর।  
আমি বললাম, 'মেহকান্দর আজ হল ২১ তারিখ। তুমি তারিখ জানতে  
চাও? কাজেই আমি ঠিক করেছি রোজ এসে তোমাকে তারিখ জানিয়ে যাব।'  
মেহকান্দর এক চোখে তাকিয়ে আছে। এক চোখের দৃষ্টি এমনতেই তীক্ষ্ণ  
হয়। আজ আরো তীক্ষ্ণ লাগছে। মেহকান্দর বিড়ি বের করে ধরাল। আমি  
অমায়িক গলায় বললাম, 'আমাকে একটা বিড়ি দাও তো।'  
মেহকান্দর বিরক্ত গলায় বলল, 'ক্যান আমারে ত্যাক্ত করতেন? আমি  
আপনের কি ক্ষতি করছি?'

বলাতে বলাতে সে পাথরের উপর আবার থুথু ফেলল। আমি বললাম,  
'পাথরের উপর থুথু ফেলো না। আমি ঠিক করেছি এই পাথরটা আমি আমার  
এক বন্ধুকে উপহার দেব। সে সর্বভুক। হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা  
করে সে খেয়ে ফেলবে। একটু সিরকা দেবে, কিছু লবণ, কিছু গোলমরিচ।  
পাথরের চাটনি।'

মেহকান্দর কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতের বিড়ি নিতে গেছে।  
কিন্তু চোখে আতন ছুঁলছে। আমি পাথরের উপর বসে পড়লাম। সন্ধ্যা হচ্ছে।  
পাথরে বসে সন্ধ্যার দৃশ্য দেখতে ভাল লাগার কথা। মেহকান্দরের মুখ ভর্তি থুথু।  
মনে হচ্ছে পাথরটা সে ব্যবহার করে থুথু ফেলার জন্যে। আমি পাথরে বসে  
থাকায় সে থুথু ফেলতে পারছে না।

৫২

'ইয়াকুব সাহেব ধ্যানন্ত হয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ। আমি ইতস্তত করে  
বললাম, ধ্যান করে কিছু পাচ্ছেন?'  
'কিছু পাওয়ার জন্যে তো ধ্যান করছি না। মনের শান্তির জন্যে ধ্যান করছি।'  
'শান্তি পাচ্ছেন?'  
'এখনো পাচ্ছি না, তবে পাব।'  
'ইয়াকুব সাহেব!'  
'হুঁ!'  
'আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?'  
'হুঁ একটু লাগছে।'  
'আমার চাদরটা কি আপনার গায়ে জড়িয়ে দেব?'  
'দিতে পারেন। তবে আপনার তো ঠাণ্ডা লাগবে।'  
'ঠাণ্ডায় আমার কষ্ট হয় না। ঠাণ্ডা সহ্য করার মত্ন আমাকে আমার বাবা  
শিখিয়ে গেছেন।'  
'মন্ত্রটা কি?'  
'আপনাকে বলা যাবে না। শুরুমুখী গুণ বিদ্যা। আপনাকে বললেই বিদ্যা চলে  
যাবে।'

'তাহলে বলার দরকার নেই। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে দিন। ভাল ঠাণ্ডা  
পড়ছে।'

'এত ঠাণ্ডা জানলে খালি গায়ে ধ্যানে বসতাম না। মিসটেক হয়ে গেছে।'  
আমি ইয়াকুব সাহেবের গায়ে চাদর জড়িয়ে দিলাম। ষপ্পের মধ্যেই শীতে  
আমার নিজের শরীর জমে গেল এবং আমি জেগে উঠে দেখি গায়ের লেপ  
মোঝেতে পড়ে আছে। আমি ঠকঠক করে কীপছি। এ বছর আবহাওয়ার কোন  
ঠিক টিকানা নেই। ক'দিন আগেই গরম ছিল — এখন আবার শীত নেমে গেছে।  
ভয়াবহ শীত। শৈত্য প্রবাহ চলছে। খবরের কাগজ বলছে এক সজাহ থাকবে।  
নেতাদের খুব সুবিধা হয়েছে। করুণ মুখ করে — সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে,  
গাবতলীতে, কমলাপুর রেল স্টেশনে শীতের কাপড় বিক্রি করতে পারছেন। সেই  
ছবি চিত্রিত দেখানো হচ্ছে। পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ ছাপা হচ্ছে। ছবির  
কাপশান—

#### শীতার্ভ মায়ের মুখে হাসি

দেখা যাচ্ছে মা একজন খালি গায়ের শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা এবং  
শিশু দু'জনের মুখ ভর্তি হাসি। দু'জনই কবলের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।  
সবাই খুশি। নেতা খুশি তিনি করুণ দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। মা এবং শিশু  
খুশি তারা করুণ পাচ্ছে। ফটোগ্রাফার খুশি দারুণ একটা ছবি তোলা গেল।

৫৪



আমি ইয়াকুব সাহেবকে ষপ্পে দেখলাম। তদ্রপোকের কেমন মমি মমি  
চেহারা। তার চোখেও কোন সমস্যা আছে। সারাক্ষণ পিটিপি করে চোখের পাতা  
ফেলছেন। শবাসনের মত শিরনীড়া সোজা করে আমার বিছানায় বসে আছেন।  
খালি গা, গা বেয়ে ঘাম পড়ছে। অথচ শীতকাল। আমি চাদর গায়েই ষপ্পের  
ভেতর কীপছি। ইয়াকুব সাহেব মাঝে মাঝে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। খালি  
গায়ের কারণে তার পাঞ্জরের সব হাড় দেখা যাচ্ছে। পাঞ্জর বের করা বুদ্ধের  
মূর্তির সঙ্গে কিছু মিল আছে। বুদ্ধদেবের কানের মত বড় বড় কান। টানা টানা  
চোখ।

আমি বললাম, ইয়াকুব সাহেব না?  
তিনি বললেন, হুঁ জনাব। আমার নাম ইয়াকুব।  
'আপনাকে ক'দিন ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেমন আছেন?'  
'হুঁ ভাল।'  
'ধ্যান করছিলেন নাকি?'  
'অনেকটা সে রকমই।'  
'সরি, আপনার ধ্যান ভাঙ্গালাম।'  
'না, ঠিক আছে।'  
'আপনি আসল ইয়াকুব তো? আপনার বাবার নাম কি?'  
'বাবার নাম শ্রী সোলায়মান।'  
'নামের আগে শ্রী বসিয়েছেন কেন? আপনি মুসলমান না?'  
'হুঁ না। আমাদের মানব ধর্ম।'  
'ও আচ্ছা, মানব ধর্ম।'  
'মানব ধর্মে নামের আগে শ্রী বসানো যায়, আবার জনাবও বসানো যায়।  
আপনার যা ভাল লাগে তাই বসাতে পারেন।'  
'জনতাম না।'

৫৩

মেঝে থেকে লেপ তুলতে গিয়ে আমি ছোটখাট একটা শকের মত পেলাম।  
আমার ঘরে বাইশ-তেইশ বছরের একটা মেয়ে। পায়ের কাছে চেয়ারে হুপচাপ  
বসে আছে। মেয়েটা প্রিকের একটা শাড়ি পরেছে। শীতের জন্যে মাথায় স্কার্ফ  
বাঁধা। মেয়েটিকে সুন্দর দেখাচ্ছে বললে ভুল হবে— অপর লাগছে বললেও কম  
বলা হয়। ষপ্প দু'শ্যার মেয়েরাই এত সুন্দর হয়। একটু আগে ষপ্পে ইয়াকুবকে  
দেখেছি— এই মেয়েটিকেও ষপ্প দেখছি না তো। আজ বোধহয় আমার ষপ্প  
দেখার দিন। না ষপ্প না, মেয়েটির গা থেকে সেটের গন্ধ আসছে। ষপ্প দু'শ্যার গন্ধ  
থাকে না। মেয়েটার চোখ ভর্তি বিষয়। ঠোঁট চেপে সে হাসছে। ঘুমের মধ্যে  
আমি হাসাকর কোন কাণ্ড করেছি কি—না কে জানে।

শান্ত চেহারার মেয়ে। নিশ্চয়ই কোন বাড়ির বড় মেয়ে, যার অনেকগুলি  
ছোট ছোট ভাই—বোন আছে। ভাই—বোনগুলি দুই। এদের সবাইকে সামলে—  
সুমলে রাখতে হয়। এ ধরনের বাড়ির বড় মেয়েদের চেহারা এ রকম হয়। এরা  
মেয়ে হিসেবে খুবই ভাল, শুধু সমস্যা একটাই— এরা সবাইকে ছোট ভাই—  
বোনের মত দেখে।

আমার যদি ঘুম ভেঙ্গে না যেত আমি নিশ্চিত সে মেঝে থেকে লেপ তুলে  
আমার গায়ে দিয়ে দিত। মাথার নিচের ব্যালিশ ঠিকঠাক করে দিত। আমি দ্রুত  
চিন্তা করার চেষ্টা করছি— মেয়েটা কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আমার পরিচিত।  
পরিচিত না হলে ঘরে ঢুকবে না। দরজা খোলা থাকলেও উকি দিয়ে দেখেই  
দরজায় টোকা দেবে। ঘরের বাইরে থেকে সাড়াশব্দ করে ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা  
করবে। মেয়েদের সম্পর্কে সবার ধারণা তারা খুব ঠেংখীলা। আসলে তা না।  
মেয়েরা ঠেং ধরে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে  
ছেলেরা যেখানে দু' তিনবার কলিং বেল টিপবে— মেয়েরা সেখানে কলিং বেল  
টিপে যেতেই থাকবে।

মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আপনি বোধহয় আমাকে দেখে খুবই বিমিত  
হচ্ছেন। ভাবছেন কে—না কে? অভ্যন্তর মত যুগন্ত মানুষের ঘরে বসে আছে।  
আমি লেপ দিয়ে গা ঢাকতে ঢাকতে বললাম, আমি মোটেই বিমিত হচ্ছি  
না। আপনাকে দেখে ভাল লাগছে।

'অপরিচিত একজন মানুষ ঘরে ঢুকে বসে আছে, তারপরেও বিমিত হচ্ছেন  
না?'

'না। কারণ আপনি মোটেই অপরিচিত নন— আপনি হলেন তামান্ন।  
ফাতেমা খালার পি.এ.।'  
মেয়েটা নিজেই এবার বিমিত হয়ে বলল, 'বুঝলেন কি করে?'

৫৫

'আমার আধ্যাতিক ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা দিয়ে টের পাচ্ছি। খালা আপনাকে আমার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলেনি?'

'বলেছেন।'

'আপনি বিশ্বাস করেননি?'

'ফ্হি-না!'

'এখন কি করছেন?'

'এখনো করছি না। আপনি অনুমান করে বলেছেন আমি তামান্না। এমন কোন জটিল অনুমানও না। সহজ অংক। দুই দুই-এ চার।'

'ঠিক বলেছেন। আমার নিজেস্বাধা ধারণা আমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে অনেকের ধারণা খুব প্রবলভাবেই আছে। আপনার ম্যাডাম অর্থাৎ ফাতেমা খালা তাদের মধ্যে একজন।'

'আমি ম্যাডামের একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'আপনাকে পাঠালো কেন? খালার টাই পরা ম্যানেজার কোথায়, বুলবুল তাইয়া?'

'উনি আছেন। তারপরেও আমাকে পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। যাই হোক, এই নিন চিঠি। আপনি চিঠি পড়ুন, আমি চললাম।'

'চিঠি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসুন। হয়ত চিঠিতে জরুরী কিছু আছে। আপনাকে দিয়েই জবাব পাঠাতে হবে।'

'আচ্ছা আপনি চিঠি পড়ুন, আমি বসছি। আপনি কি দরজা খোলা রেখে ঘুমান? চোর ঢুকে না?'

'ঢুকে। আমার ঘরের জিনিসপত্র দেখে লজ্জা পেয়ে চলে যায়। চোরদেরও কিন্তু চক্ষু লজ্জা আছে।'

'ঘর খোলা রেখে ঘুমান কেন? চোরদের লজ্জা দেবার জন্মো?'

'তা না। আমার বাবা আমাকে খোলা মাঠে ঘুমতে বলেছেন। খোলা মাঠের বিকল্প হিসেবে খোলা ঘর।'

'আমি চিঠি পড়া শুরু করেছি। তামান্না আড়চোখে আমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে আমার চিঠি পড়া দেখে সে মজা পাচ্ছে। খালা তাঁর দুর্বোধ্য হাতের লেখায় লিখেছেন—

হিমু,

তুই যে গেলি আর তো দেখা নেই। একদিন শুধু টেলিফোনে হড়বড় করে কিসব বললি। মাথার যন্ত্রণায় সব বুঝতেও পারলাম না। ইয়াকুবকে খোঁজার ব্যাপারে কি করছিস আমাকে জানাবি না? না-কি ভুলেই গেছিস যে,

তোকে একটা দায়িত্ব দিয়েছি? তোর চশমা, চাদর, নতুন পাঞ্জাবী সব তো ফেলে গেলি।

ঐদিন একটা ভুলও করেছি — ইয়াকুবকে খুঁজে বের করার জন্মো তোকে কিছু খরচ দেব বলে ভেবে রেখেছিলাম। সেদিন যাবার সময় তুই এমন ভাড়াহুড়া শুরু করলি যে খরচ দেবার কথাটাই মাথা থেকে দূর হয়ে গেল।

তুই রবি সোম এই দু'দিন বাদ দিয়ে যে কোন একদিন চলে আর। ম্যানেজারকে না পাঠিয়ে ইচ্ছে করে তামান্নাকে পাঠলাম। যাতে তোর সঙ্গে পরিচয় হয়। কৌশলটা ভাল করিনি? মেয়েটাকে নিশ্চয়ই তোর পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হবার মতই মেয়ে। দেখতেও খুব সুন্দর তাই না? রঙটা শুধু যদি আর এক পোছ সালা হত তাহলে আর চোখ ফেরানো যেত না। মেয়েটা যে এত সুন্দর এটা তোকে ইচ্ছে করেই আগে জানাইনি। বরং ইচ্ছা করে বলেছি মেয়েটা ডাউন টাইপ। আগে জানিয়ে রাখলে তুই কখনায় উর্বশী বা মেনকা ভেবে রাখতি। তখন আর তামান্নাকে এখন যত সুন্দর লাগছে তত সুন্দর লাগত না।

হিমু, তোকে আশ্রয় লোহাই লাগে তুই এমন কিছু করিস না যেন মেয়েটা চিরদিনের জন্মো তোর প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। তোর আচার-আচরণ, কথাবার্তা কিছুই ভাল না। তোর টাইপের ছেলেদের কাছ থেকে মেয়েরা একশ হাত দূরে থাকে। কাজেই ইচ্ছা বিরুদ্ধে হলেও মেয়েরা যেসব আচরণ পছন্দ করে সে রকম আচরণ করবি।

আমি রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছি মেয়েরা এটেনশান খুব পছন্দ করে। তুই এমন ভাব করবি যেন তামান্নার ধারণা হয় তুই তার দিকে খুব এটেনশান দিচ্ছিস। তোর ফাজলামি ধরনের রসিকতাজগলি অবশ্যই করবি না। মেয়েরা রসিকতা পছন্দ করে না। এটাও রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছি। মেয়েরা সিরিয়াস টাইপ পুরুষ পছন্দ করে। যারা রসিকতা করে মেয়েরা তাকে ছাফলা ভাবে।

আমি যা বলছি তোর ভালর জন্মোই বলছি। তোর খালু তোকে খুব পছন্দ করতো। এই জন্মোই তোর জন্মো আমার কিছু করতে ইচ্ছে করে, যদিও খুব ভাল করেই জানি যে মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে তার জীবনটা ছাফল্য হয়ে যাবে।

তুই ভাল থাকিস। ইয়াকুবের ব্যাপারটা মনে রাখবি। আমি খুব টেনশানে আছি। ঐ ব্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার পেটে গ্যাস হচ্ছে। গ্যাসের চিকিৎসার জন্মো দেশের বাইরে যাব। সিঙ্গাপুরে আমেরিকান হসপিটালটা নাকি খুব ভাল। আরেকটা হসপিটাল আছে এলিজাবেথ

হসপিটাল। দু'টার একটায় যাব। এখনো ফাইনাল করিনি। আশ্বা হিমু শোন, তুই কি আমার সঙ্গে যাবি? তুই তো দেশের বাইরে কখনো যাসনি। এই ফাঁকে বিদেশ সেবা হল। আমি ঠিক করে রেখেছি তামান্নাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তুই যদি সঙ্গে থাকিস তাহলে ভালই হয়, মাঝে মধ্যে তামান্নাকে নিয়ে শপিং গেলি। বা দু'জনে মিলে ছবি দেখলি। এইভাবেও মেয়েটার সঙ্গে তোর ভাব হতে পারে। যাই হোক, অনেক কথা লিখে ফেললাম। ভাল থাকিস।

তোর ফাতেমা খালা।

চিঠি শেষ করে আমি তামান্নার দিকে তাকালাম। সে আগের মতই মিটি মিটি করে হাসছে। এখন মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে ফেলেছে। স্কার্ফ খোলার জন্যে তাকে আরো সুন্দর লাগছে। তার মাথা ভর্তি ফুলানো-ফাপানো চুল। তামান্না যদি ছেলে হত তাহলে নাপিতরা তার চুল কেটে খুব মজা পেত। গোছা গোছা চুল কাটা হবে। শব্দ হবে কচকচ কচকচ।

আমি বললাম, 'আপনি চিঠিটা পড়েছেন তাই না?'

তামান্না হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'জ্বি। দয়া করে ম্যাডামকে কিছু বলবেন না। ম্যাডাম বিশ্বাস করে এই চিঠি আমার হাতে পাঠিয়েছেন। আমি বিশ্বাসভঙ্গের কারণ হয়েছি।'

'পড়লেন কেন?'

'ম্যাডামের সব চিঠিপত্র আসলে আমি লিখে দেই। উনি শুধু সই করেন। এই চিঠিটা উনি নিজে অনেক সময় নিয়ে লিখলেন। নিজেই খামে মুখ বন্ধ করলেন। খামের মুখ ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কি-না নানানভাবে পরীক্ষা করলেন। এতে আমার কৌতূহল খুব বেড়ে গেল। এবং কি জন্যে জানি আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলাম চিঠিটার আমার প্রসঙ্গে লেখা আছে। সেই কারণেই খুলে পড়েছি। আমার মস্ত বড় ভুল হয়েছে। আমি খুবই লজ্জিত।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি না, চা খাব না।'

'কফি খাবেন?'

তামান্না ডাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'খালা আপনার প্রতি এটেনশান দিতে বলেছেন এই জন্যেই চা-কফির কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'জ্বি না, কফিও যাব না।'

'ঠাণ্ডা কিছ? পেপসি বা কোক কিংবা লাঙ্কি?'

তামান্না হেসে ফেলল। শব্দ করে হাসি। হেসেই বোধহয় তার মনে হল হাসা ঠিক হয়নি। সে গভীর হতে চেষ্টা করল। মানুষের চরিত্রে তরল ভাব চলে

এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কঠিন করা সহজসাধ্য না। মেয়েটা গভীর হতে চেষ্টা করছে, পারছে না। আমি বললাম, 'আপনি বসুন আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি। তারপর চলুন বোটানিকেল গার্ডেন দেখে আসি। না-কি চন্ড্রিমা উদ্যানে যেতে চান? বিবাহপূর্ব প্রেমের জন্যে চন্ড্রিমা উদ্যান ভাল।'

তামান্না আবারো হেসে উঠল। মেয়েটা ভাল হাসতে পারে। কিংবা এও হতে পারে যে, সে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে হাসার সুযোগ তেমন নেই। অনেকদিন পর মন খুলে হাসতে পারছে।

তামান্না এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'চা দিতে বলি চা খান?'

'জ্বি আশ্বা।'

'তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকতে পারবেন?'

তামান্না অবাক হয়ে বলল, 'চোখ বন্ধ করতে হবে কেন?'

'আমি খালি গায়ে লেপের তেতর বসে আছি। চোখটা বন্ধ করলে লেপটা ফেলে দিয়ে শার্ট গায়ে দিতে পারি। সুন্দরী একটা মেয়ের সামনে খালি গা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

'আমি আজ চলে যাই, আরেকদিন এসে চা খাব।'

'আশ্বা ঠিক আছে।'

তামান্না উঠে দাঁড়াল। মাথায় স্কার্ফ পরল। আবার বসে পড়ল। সে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বলবে। সিরিয়াস ধরনের কোন কথা। ছেলেরা হটহাট করে সিরিয়াস কথা বলে ফেলতে পারে। মেয়েরা পারে না। তাদের সিরিয়াস কথা বলার জন্যে সামান্য হলেও আয়োজন লাগে। তামান্না সেই আয়োজন করছে। কি বলবে তা আমি মনে হচ্ছে আন্দাজ করতে পারছি।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'ম্যাডাম আপনার সম্পর্কে আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। আমি ম্যাডামের কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। ধরে নিচ্ছি উনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু....'

'আমাকে বিয়ে করা আপনার পক্ষে সম্ভব না, তাই তো?'

'জ্বি।'



‘আমাকে বিয়ে দেবার দায়িত্ব ম্যাডামকে দেয়া হয়নি। উনি আগবাড়িয়ে সেই দায়িত্ব কেন নিচ্ছে চাচ্ছেন তাও জানি না। বিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। উনি কেন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবেন?’

‘আমি কি খালাকে নিষেধ করে দেব?’

‘না। ম্যাডাম বিরক্ত হবেন। আমি কিছুতেই ম্যাডামকে বিরক্ত করতে চাই না। উনার মতের বাইরে গেলেই আমার চাকরি চলে যাবে। তাই—বোন নিয়ে আমি পথে বসব। কি যে করব কিছু বুঝতে পারছি না।’

‘আমি একটা পরামর্শ দেই?’

‘নিঃ’

‘মনে করুন আপনি হাওড়ের মাঝখানে নৌকা নিয়ে আছেন। দুর্ঘটনায় আপনার হাত থেকে বৈঠা পড়ে গেছে। আপনার নৌকায় পাল ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থায় আপনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে হাওড় পাড়ি দেয়া। কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটা বড় কথা নয়। হাওড় পাড়ি দেয়া বড় কথা। কাজেই আপনাকে যে দিকে হাওয়া সেদিকে পাল দিতে হবে। আপনার ম্যাডাম হচ্ছেন হাওয়া, হাওয়া যেদিকে বইছে সেই দিকে পাল তুলে দিন।’

‘আপনাকে বিয়ে করতে বলছেন?’

‘তা বলছি না। খাবার সব কথায় সায় দিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন। বিয়ের পিঁড়িতে বসে হঠাৎ বলবেন—একটু বাধক্রমে যেতে হবে। এই বলে প্যার প্যার।’

‘রসিকতা করছেন?’

‘মোটেই রসিকতা করছি না। বিয়ে নিয়ে একটা পাতানো খেলা খেলতে আমি রাজি আছি।’

তামান্না উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আপনাকে কোন কিছুতে রাজিও হতে হবে না, অরাজিও হতে হবে না। আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। আমার সমস্যার সমাধান সবসময় আমি নিজে করেছি, এখনো তাই করব।’

‘কি আশ্বা?’

‘আপনি শুধু দয়া করে এখন আপনার সঙ্গে যেসব কথা হল তা খালাকে বলবেন না।’

‘কি আশ্বা?’

তামান্না রুস্ত ভঙ্গিতে চলে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটার উপর রাগ হচ্ছে।

৬০

আমার নিজের ধারণা বাবার সাধনা বিফলেই গেছে। তার পুত্র বর্তমানে পরম আরোহের সন্ধান করছে—ইয়াকুবের।  
আমি হাত-মুখ ধুতে গোলাম। আজ অনেকগুলি কাজ করতে হবে। ব্যাঙটিকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাঙটিকে দিয়ে অরু হবে অভিমান—

In search of Yakub.

যে কোন অনুসন্ধানই দু’জন থাকলে ভাল হয়। হিমালয়ে হিলারী একা উঠেননি, সঙ্গে ছিল তেনজিং।

দরজায় টকটক শব্দ হচ্ছে। তামান্না ফিরে এল না—কি? আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, ‘কে?’

ছকু গলা বের করল। সে কোকের বোতল ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। সিগন্যাল না দিতেই চা নিয়ে এল ব্যাপার কি?

‘কি খবর ছকু?’

‘কি খবর ভাল।’

ছকু চায়ের বোতল নামিয়ে রাখল। পরোটা ভাজির বাটি সাজাতে বসল। আজ দেখি পরোটা ভাজির সঙ্গে ভিমের ওমলেট উকি দিচ্ছে। এইখানেই শেষ না। আরেকটা বাটিতে বোল জাতীয় কিছু। সেখানে মুরগির ডানার হাড় ভুব দিয়ে আছে। আমি বিখিত হয়ে বললাম, ‘ব্যাপার কি?’

‘ব্যাপার কিছু না।’

‘তুই দেখি রাজাবাদশার খাবার নিয়ে এসেছিস। করেছিস কি? দু’টাকা হল আমার নাশতার বাজেট। পরোটা ভাজি রেখে বাকি সব ফিরিয়ে নিয়ে যা।’

ছকু লজ্জিত মুখে বলল, ‘খান। আইজের খানা ফিরি।’

‘ফিরি কেন?’

‘আইজ আমি খাওয়াইতেছি।’

‘ভাল। বোলের মত ঐ জিনিসটা কি?’

‘ছুপ। মুরগির ছুপ।’

হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। পরোটা ছিঁড়ে মুরগির ‘ছুপ’ ভিজিয়ে খাছি। ছকু আনন্দিত চোখে আমাকে দেখছে। পরোটাগুলি আশুন পরম। ছুপ জিনিসটা দেখতে কুৎসিত হলেও খেতে ভাল। আমি তৃপ্তি করে খেলাম। খাওয়া শেষ করে বললাম, ‘খেয়ে আরাম পেয়েছিরে ছকু। এখন বল কি চাস? ঝটপট বলতে হবে। যা চাইবি তাই পাবি। কি চাস তুই?’

৬২

অধঃ রাগ লাগার তো কোন কারণ নেই। আমার অবচেতন মন কি চাচ্ছিল—এই মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাব হোক? হাসিঠাট্টা করে বললেও কি মনের একটি অংশ সত্যি সত্যি চাচ্ছে যে তাকে নিয়ে আমি চন্দ্রিমা উদ্যানের হাঁটতে বের হই।

আমার বাবা তার পুত্রের জন্যে লিখিতভাবে যে উপদেশমালা রেখে গেছেন সেখানে বারবার আমাকে একটি ব্যাপারেই সাবধান করা হয়েছে—

বাবা হিমালয়,

হিন্দু নারী সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত লোক-শ্লোক আছে—

“পুড়ল কন্যা

উড়ল ছাই

তবেই কন্যার

গুণ গাই।”

অর্থাৎ কন্যার দাহকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার গুণকীর্তন করা যাবে না। মৃত্যুর আগমুহুর্তেও তার পা পিছলাতে পারে। সে ধরা দিতে পারে প্রলোভনের ফাঁদে। পা রাখতে পারে চেরাবালিতে।

এটা শুধু হিন্দু মেয়ে না, সবার জন্যে প্রযোজ্য। এবং তোমার জন্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মায়ী যখন হাতছানি দিবে তখন তোমাকে রক্ষা করার জন্যে কেউ থাকবে না। মায়াকে মায়ী বলে চিনতে হবে। এই চেনাই আসল চেনা।

প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে আরেকটি শ্লোক বলি। শ্লোকটি রচনা করেছেন চাক মূনির পুত্র। তাঁর জন্মস্থান তক্ষশিলা। তিনি ছিলেন মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শদাতা। যাই হোক, শ্লোকটা এ রকম—

“আহার নিদ্রা ভয় মৈথুননি

সমানি চৈতাদি নুনাং পশুনাম।

জ্ঞানী নরানামধিকো বিশেষ্যো।”

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশু এবং মানুষদের ভেতর সমভাবেই বিদ্যমান।

কিন্তু মানুষ জ্ঞানী—আর এখানেই তার বিশিষ্টতা।

চানক্যের এই শ্লোক সব মানুষের জন্যে প্রযোজ্য কিন্তু তোমার জন্যে নয়। পশু এবং মানুষের ভেতর যা সমভাবে বিদ্যমান তোমাকে তা থেকে আলাদা করার চেষ্টা আমি করছি। কতটুকু সফল হয়েছে আমি জানি না। তবে আমার ধারণা—আমার সারাজীবনের সাধনা বিফলে যাবে না। তুমি সন্ধান পাবে পরম আরোহের।

৬১

ছকু ফ্যালফ্যাল করে ডাকিয়ে আছে। কিছু বলতে পারছে না। আমি চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললাম, ‘আশ্চর্য এ রকম একটা সুযোগ মিস করলি। মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারলি না।’

ছকু মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছে সে বিরাট সুযোগ হেলায় হারিয়েছে।

‘তোমার কিছু চাইবার নেই?’

‘অছে।’

‘সেটা কি?’

‘একটা দোকান দিতে ইচ্ছা করে।’

‘চায়ের দোকান?’

‘কি না ইন্ট্রিশন দোকান।’

‘স্টেশনারী দোকান?’

‘ক্লে। নানান পদের বাজে মাল থাকবে।’

‘ভুল করলি, তোমার ব্যাটা যখন চাইবার তখন চাইলি না।’

‘এমন সুযোগ আর আসবে না?’

‘সুযোগ তো বার বার আসে না। হঠাৎ হঠাৎ আসে—’

মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে। কাঁদুক। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছে তখন ঈদতে তো হবেই।

৬৩



মেসের ম্যানেজার খবর পাঠিয়েছে — রুপটানা কাগজে পেনসিলে লেখা —  
মোটো এক আদমী দেখা করতে এসেছে। সিড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠবে না। তার  
ঘরে বসে আছে। লোকটাকে ভাল মনে হচ্ছে না। এখন কি করণীয়?

আমি নিচে নেমে দেখি ব্যাঙাচি। গভীর মনোযোগে বাসি খবরের কাগজ  
পড়ছে। ব্যাঙাচিকে আজ আরো মোটা লাগছে। তার গায়ের শার্টটা জমকাল। লাল  
নীল ফুল লতা পাতা সাপ খোপ আঁকা। সাহেবরা হাওয়াই দ্বীপ বেড়াতে গেলে  
এ রকম শার্ট পরে। তাদের বগলে থাকে রোগা পটকা মেয়ে। যে সাহেব যত  
মোটো তার বগলের তরুণী ততই রোগা। রোগা পটকাদের এ রকম শার্ট মানায়  
না।

ব্যাঙাচি আমাকে দেখে মুখ ভর্তি করে হাসল। আমি বললাম, নাশতা খেয়ে  
বের হয়েছিল?

হঁ।

'কি নাশতা? পরোটা ক'টা ছিল?'

'পরোটা না আটার রুটি। দেড় পিস রুটি।'

'বলিস কি? রুটির সঙ্গে কি?'

'পেঁপে ডালি। আধা কাপ কমলার রস।'

'বাস আর কিছু না?'

'দেস্ত আর কিছু না। তোর ভাবী আমাকে খেতে দেয় না। তার ধারণা খেতে  
না দিলে আমি বোধহয় আগের মত হয়ে যাব।'

'না খেলেও তুই ফুলতে থাকবি?'

'অবশ্যই। এখন একবার ওজন নে। না খাইয়ে সাতদিন একটা ঘরে বন্দি  
করে রাখ। সাত দিন পর ওজন নে, দেখবি ওয়েট এগারো কেজি বেড়েছে।'

'সর্বনাশ!'

'সারাক্ষণ পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুরি, দেস্ত। ক্ষুধা কমে না। আমার জীবনের  
একটা শখ কি জানিস দেস্ত। একটাই শখ মনের তৃপ্তিতে একবেলা খাব। ক্ষিধে

না মোটা পর্যন্ত খেয়েই যাব। মানুষের নানা রকম ভাল ভাল শপ্ন থাকে—আমার  
এই একটাই শপ্ন। জানি না শপ্ন সত্যি হবে কিনা।'

'ইনশাআহ হবে।'

'তুই যদি কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে যাস তাহলে ভালমত একবেলা  
খাওয়াবি।'

'অবশ্যই খাওয়াব।'

'প্রমিষ্ট করছিস তো?'

'হ্যাঁ, প্রমিষ্ট।'

'তোকে আমি সাহায্য করব। জান দিয়ে সাহায্য করব। ঐ লোকটাকে খুঁজে  
বার করব। পথেঘাটে খুঁজলে হবে না। সিগ্কেটমেকালি খুঁজতে হবে। প্র্যান করে  
একত হবে।'

'আয় প্র্যানটা করি?'

ব্যাঙাচি চোখমুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'চল, কোন একটা রেইস্ট্রেটে বসে  
প্র্যান করি। তোর চেনা-জানা কোন রেইস্ট্রেট আছে যেখানে বাকি দেবে?'

আমি বললাম, 'তোর ঐ রেইস্ট্রেটে যাই— কান্দি রসা যেখানে বাস?'

ব্যাঙাচি মুখ করুণ করে বলল, 'ঐ রেইস্ট্রেটে দুপুরের আগে খুববে না।  
পাঁচশ টাকার একটা নোট পকেটে নিয়ে বের হয়েছিলাম—আরাম করে নাশতা  
করব। তোর ভাবী পকেট সার্চ করে নিয়ে নিয়েছে। পকেটে স্কচ টেপ মারা এক  
টাকার একটা নোটও নেই। মাঝে মাঝে মনের দুঃখে ভাবি কাক হয়ে কেন  
জন্মালাম না।'

'কাক হয়ে জন্মালে লাভটা কি হত?'

'মনের সুখে ময়লা খেতাম। ঢাকা শহরে আর যাই হোক ময়লার অভাব  
কই।'

ব্যাঙাচি ফুস করে নিঃশ্বাস ফেলল। আমি তাকে নিয়ে গেলাম বিসমিল্লাহ  
রেইস্ট্রেটে। রেইস্ট্রেটের ম্যানেজার জোবেদ আলি কোন কারণ ছাড়াই আমার  
ভক্ত। সে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, জোবেদ আলি সাহেব, গরম  
গরম পরোটা ভেজে আমার বন্ধুর প্রেটে ফেলতে থাকবেন। পরোটার সঙ্গে কি  
আছে? পেঁপে ডালি বাদ দিয়ে যা আছে সবই দিন। যেটা ভাল লাগবে সেটা বেশি  
করে নেবে।

রেইস্ট্রেটে মোটামুটি একটা ছড়াছড়ি পড়ে গেল। ছক্কুর ডিউটি পড়ল  
আমাদের খাওয়ানো। ব্যাঙাচি আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, 'দেস্ত,  
তুই তো সাধারণ মানব না। মহামানব। আমি খুশি হয়েছি। যা প্রমিষ্ট করলাম—

তোর ঐ লোক না পাওয়া পর্যন্ত আমি দাড়ি-পোফ ফেলব না। যদি দাড়ি-পোফ ফেলি তাহলে আমি বাপের ঘরের না। আমি বেজনা।'

আমি আবারো মুগ্ধ হয়ে ব্যাঙটির খাওয়া দেখছি। শুধু আমি না, ছুই এবং জোবেদ আলিও মুগ্ধ। এত তৃষ্ণা নিয়ে যে কেউ খেতে পারে তাই আমার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে খাওয়ার ব্যাপারটাকে সে উপাসনার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

'দেস্ত?'

'খাওয়া শেষ করে তারপর কথা বল।'

'খেতে খেতেই বলি। খাওয়া শেষ হতে দেরি হবে। তোর ঐ লোক আগে কোথায় থাকত বললি?'

'অতীশ দীপংকর রোড।'

'তাহলে আমাদের অনুসন্ধানের সেন্টার হবে অতীশ দীপংকর রোড। ঐ লোক অতীশ দীপংকর রোডের আশপাশেই আছে।'

'বুঝলি কি করে?'

'বাড়ি ভাড়া করে যারা বাস করে তারা বাড়ি বদলালেও সেই অঞ্চলেই থাকে, দূরে যায় না। যে ঝিকাতলায় থাকে সে কখনো বাড়ি বদলে কলাবাগানে যাবে না। ঝিকাতলার আশপাশেই ঘুরঘুর করবে।'

'যুক্তি ভাল।'

'আমাদের খোঁজ করতে হবে মুদির দোকানে। নাপিতের দোকানে।'

'চায়ের ষ্টল?'

'না, চায়ের ষ্টল না। বাড়ির আশপাশের চায়ের ষ্টলে শুধু ব্যাচেলাররা চা খায়। যার ঘর-সংসার আছে সে বাড়ির পাশে চায়ের দোকানে চা খাবে না। সে বউকে বা মেয়েকে চা বানিয়ে দিতে বলবে।'

'ঐ লোকের বউ বা মেয়ে আছে কি-না তা তো জানি না।'

'তাহলে একটা সমস্যা হয়ে গেল। যাই হোক অসুবিধা হবে না। বিটের পোষ্টম্যানকে ধরতে হবে। এদের স্মৃতিশক্তি ভাল হয়। নাম বলা মাত্র চিনে ফেলাতে পারে।'

'পোষ্টম্যানের কথা আমার একবারও মনে হয়নি।'

'রেশনের দোকান উঠে গেছে। রেশন শপ থাকলে সমস্যা হত না। ভাল ভাল জিনিসই দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে।'

ব্যাঙটির খাওয়া শেষ হয়েছে। সে তৃষ্ণার নিঃশ্বাস ফেলে চা দিতে বলল। তার পেটে নিশ্চয়ই এখনো ক্ষিপে আছে। তবে প্রবল ক্ষিপের সমস্যা মিটেছে তা বোঝা যায়।

৬৬

'হেঁজী খেয়েছি দেস্ত। তোর কাছে অনুগ্রহ হয়ে গেল। যাই হোক ষণ শোধ করব, চিন্তা করিস না। বিষয়টা নিয়ে সিরিয়াস চিন্তা করছি। অতীশ দীপংকর রোডের পোষ্টম্যান হল আমাদের সার্কেলের কেন্দ্রবিন্দু। তারপর ধীরে ধীরে সার্কেলটা বড় করব। পাঁচ বছর আগে হলে শস্ত্রী থেকে চট করে বের করে ফেলা যেত। এখন আর যাবে না। ঢাকা শহরে লক্ষ্মী নেই। লোকজন এখন আর ধোপাখানায় কাপড় ধোয় না।'

'এটা তো লক্ষ্য করিনি।'

'তোর লক্ষ্য না করলেও হবে। আমি করছি। ব্যাটাকে বুজে বের করার দায়িত্ব এখন আমার। তোর অনুগ্রহ শোধ দিতে হবে। চল উঠি, একপানে নেমে পড়ি।'

'যে খাওয়া খেয়েছিল হাঁটতে পারবি তো?'

ব্যাঙটি করণ গলায় বলল, হাঁটতে পারব না দোস্ত। রিকশা নিতে হবে। এখন হাঁটলে আবার ক্ষিপে পেয়ে যাবে। অনেক কষ্টে ক্ষিপেটা চাপা দিয়েছি।

রেস্টুরেন্টে বাকি খাওয়া যায়—বাকিতে রিকশা পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। সম্ভব না বলেই আমার ধারণা। লিফট পাওয়া গেলে দয়। বিদেশে এই সব ক্ষেত্রে বুড়ো আঙ্গুল তুলে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে। কারোর হাত হলে তুলে নেয়। বাংলাদেশে লিফট প্রথা চালু হয়নি। কার দায় পড়েছে নিজের কেনা গাড়িতে অন্যকে চড়াবো।

অবশ্য এ জাতীয় পরিস্থিতিতে গাড়িওয়ালা মানুষের কাছ থেকে মাঝে মাঝে আমি উৎসাহবাজ্ঞক সাড়া পেয়েছি। শুধু উৎসাহবাজ্ঞক বললে তুল হবে, খুবই উৎসাহবাজ্ঞক। একবার উত্তরার কাছে এক পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রাত একটার মত বাজে। পান-সিগারেটের একটা দোকান খোলা। সেও বন্ধের উপক্রম করছে। হেঁটে হেঁটে টাকায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। একটা মিলিটারী জীপ এসে থামল। জীপের ড্রাইভার নেমে এল সিগারেট কিনতে। ড্রাইভারের পাশে বিষণ্ণমুখে যে অফিসারটি বসে আছেন মনে হয় তাঁর জন্যই সিগারেট কেনা হচ্ছে। অফিসার কোন স্তরের বুঝতে পারছি না। এত বিষণ্ণ কেন তাও বুঝতে পারছি না। যুদ্ধটুকু হচ্ছে না বলেই মনে হয় বিষণ্ণ। যুদ্ধ নেই কাজেই কাজও নেই। আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আমি বললাম, স্যার আপনার গাড়ির পেছনটা তো ফাঁকা। আপনি কি একজনকে পেছনে বসিয়ে ঢাকা নিয়ে যাবেন? তার খুব উপকার হয়।

অফিসার কিছু বললেন না। একবার আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে ড্রাইভার সিগারেট নিয়ে ফিরেছে। তিনি সিগারেট নিয়ে প্যাকেট খুলে

৬৭

সিগারেট বের করতে শুরু করেছেন। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে যাচ্ছে। তিনি ড্রাইভারকে নিচু গলায় কি বেন বললেন—ড্রাইভার অত্যন্ত বিম্বিত হয়ে নেমে এল। জীপের পেছনটা আমাকে খুলে দিল।

আমি উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল। সেই অফিসার আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি সিগারেট খেলে ধোঁয়াতে আপনার কি অসুবিধা হবে?'

আমি বললাম, 'অসুবিধা হবে না, স্যার। বরং সুবিধা হবে। অনেকক্ষণ সিগারেট খাচ্ছি না। আপনার সেকেন্ড হ্যান্ড ধোঁয়া পাব।'

'তিনি তাঁর গ্যাকেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, নিন, সিগারেট নিন।'

আমি সিগারেট নিলাম। তিনি জীপের ডায়ালবোর্ডে কি একটা টিপলেন, ওমনি ক্যাসেটে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুরু হয়ে গেল—

"বধু কোন আলো লাগল চোখে"

মিলিটারী জীপ হুঁম-হাম করে অনেক সময়ই আমার পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। সেখান থেকে কখনো রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে আসতে শুনিনি। আমার ধারণা মিলিটারী জীপে ক্যাসেট বাজানোর যন্ত্রই থাকে না। আর থাকলেও ট্রান্সপেট জাতীয় বাজনা বাজবে না। রবীন্দ্রনাথ না।

আমি বললাম, স্যার, আমাকে ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি যে কোন জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।

বিষণ্ণ চেহারার ভদ্রলোক তার জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছে তিনি আপনমনে গান শুনছেন। মিলিটারীর গান শোনাও অদ্ভুত! মাথা দুলানো না। পা দুলানো না। এটেনশন ভঙ্গিতে গান শোনা।

ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি তিনি আমাকে নামিয়ে দিলেন না। গাড়ি প্রথমেই চলে গেল ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। স্যানিটোর পর স্যানিটু পড়তে লাগল। ভদ্রলোক যে বিরাট বড় দলের কেউ এখন বুললাম।

তিনি জীপ থেকে নামলেন। ড্রাইভারকে বললেন, উনাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দাও।

আমি বললাম, 'স্যার, কোন দরকার নেই। আমার হেঁটে অত্যাস আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে, কোন সমস্যা নেই। নিন আরেকটা সিগারেট নিন। ওয়ান ফর দ্য রোডে। আচ্ছা, রেখে দিন। প্যাকেটটা রেখে দিন। আমি সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছি। আজ সোতে পড়ে কিনে ফেলেছি।'

৬৮

ড্রাইভার অবশ্য আমাকে আমার মেস পর্যন্ত নিয়ে গেল না। ক্যান্টনমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে সামান্য এগিয়ে কঠিন ব্রেক করে গাড়ি থামাল। তার চেয়ে কঠিন গলায় বলল, 'নামেন।'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে ড্রাইভারকে বললাম, 'তাই সাহেব আপনার না আমাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা?'

'নামতে বলছি, নামেন।'

আমি হুড়ুমুড়ু করে নেমে পড়লাম। মিলিটারী মানুষ রেগে গিয়ে চড়-খাঙ্গর মেরে বসতে পারে। কি দরকার।

কাজেই আমাদের দেশের গাড়িওয়ালারা পথচারীদের প্রতি একেবারেই যে দয়া দেখান না, তা না। মাঝে মাঝে দেখান। সেই মাঝে মধ্যেটা আজও হতে পারে। মিঠি কথায় চিড়া ভেজে না বলে গাড়িওয়ালানের মন ভিজবে না কেন। গাড়িওয়ালানের মন এমনতেই খানিকটা তেজা অবস্থায় থাকে।

আমি ব্যাঙটিকে নিয়ে গাড়ির সন্ধানে বের হলাম। আমাদের টার্গেট বন্ধককে নতুন গাড়ি। দামী গাড়ি। পাঞ্জেরো টাইপ। চড়বই যখন দামী গাড়িতেই চড়ি।

যেসব গাড়ি পছন্দ হচ্ছে তার কোনটাই দাঁড়াচ্ছে না—হোস করে চলে যাচ্ছে। গাড়িগুলি থামানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে কাকতালুয়ার মত দু'হাত মেলে দাঁড়ানো। আমি আর ব্যাঙটি দু'জন হাত ধরাধরি করে রাস্তা আটকালে গাড়ি থামতে বাধ্য। প্রথমে একটা ধামবে তার পেছনে আরেকটা। দেখতে দেখতে সিরিয়াস যানজট লেগে যাবে। গাড়িতে গাড়িতে গিঁটু। কেউ বুঝতে পারবে না যানজট কেন হচ্ছে। এক সময় শুভব ছড়িয়ে পড়বে—যানজট হচ্ছে কারণ সামনে মিছিল বের হয়েছে, গাড়ি ভাঙাধাক্কি হচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্য শুভব বলেই সবাই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেলবে। পেছনের গাড়িগুলি তখন চেষ্টা করবে উল্টো দিকে ঘুরতে। এই চেষ্টার ফলে এমন যানজট হবে যে সারাদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। রাজনৈতিক নেতারা খবর পাবেন যে মিছিল বের হয়েছে, গাড়ি ভাঙছে হচ্ছে। তাঁরা ভাববেন যেহেতু তাঁরা মিছিল করেননি—কাজেই বিপক্ষ দল মিছিল বের করেছে। তাঁরা আশ্বালনে পিছিয়ে পড়েছেন। কি সর্বনাশ! তাঁরা তড়িঘড়ি করে জঙ্গি মিছিল বের করবেন। এবং তখন সত্যি সত্যি শুরু হবে গাড়ি ভাঙাধাক্কি।

পুলিশের টায়ার গ্যাস নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট। টায়ার গ্যাসের সেল মারবে কি, মারবে না বুঝতে পারছে না। সরকারী দলের মিছিলে টায়ার গ্যাসের সেল মারতে খবর আছে। এই হাঙ্গামার মধ্যে কেউ না কেউ মারা যাবে। নাম পরিচয়হীন সেই

৬৯

লাশ নিয়ে পড়ে যাবে কাড়াকড়ি। একদল বগবে এই লাশ বিএনপি কর্মীর, আরেক দল বলবে আওয়ামী লীগের। অথচ কেউ জানে না মৃত মানুষের কোন দল থাকে না।

আমি ব্যাঙাটিকে আমার সঙ্গে বাস্তায় দাঁড়া করতে পারলাম না। সে চোখ রূপালে তুলে বলল, 'দোস্ত তুই কি পাপল হয়ে গেলে নাকি? গাড়ি আমাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। তুই শেষ মুহুর্তে লাফ দিয়ে পার পাবি। আমি তো লাফও দিতে পারি না। নাম ব্যাঙাটি হলে কি হবে লাফাতে তো পারি না। আমি বরং রাস্তার পাশে দাঁড়াই।'

ব্যাঙাটি চিন্তিত মুখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দু'হাত মেলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে ফল পেলাম। প্রায় নতুন একটা পাঞ্জেরো জীপ (আমার খুব পছন্দের গাড়ি) আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে এক সানগ্রাস পরা লোক মাথা বের করে বলল, কি ব্যাপার?

ভদ্রলোককে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বুঝতে পারছি না। সানগ্রাস খুললে হয়ত চিনতে পারব।

'আপনি কি চাচ্ছেন?'

'স্যার, আমরা দুই বন্ধু আপনার কাছে লিফট চাচ্ছি। আমাদের অতীশ দীপংকর রোডে নামিয়ে দিন।'

'লিফটের জন্মে হাত উচিয়ে গাড়ি থামলেন?'

'হুঁ!'

'আসুন, উঠে আসুন। আপনার বন্ধুকেও ডাকুন।'

ব্যাঙাটি গাড়িতে উঠতে উঠতে ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'দোস্ত, তোর প্রতিভা দেখে আমি মুগ্ধ। তুই তো মানব না, মহামানব। গাড়িতে লোকজন না থাকলে আমি তোর পায়ের ধূলা নিতাম।'

গাড়ি অতীশ দীপংকর রোডের দিকে গেল না। রমনা থানার সামনে থামল। চশমা পরা ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা নামুন। আমি আপনাদের পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'চেনাচেনা লাগছে। আপনি কি বিখ্যাত কেউ?'

'আমি বিখ্যাত কেউ না। আগে একদিন আপনি আমাকে উস্টাপান্টা প্রশ্ন করেছিলেন। আমি গাড়ির কাচ তুলে দিলাম—আপনি বাইরে থেকে ভেদেট কাটছিলেন। নানান অঙ্গভঙ্গি করছিলেন। এখন চিনতে পেরেছেন?'

'হুঁ। এখন চিনতে পারছি। চোখে সানগ্রাস থাকায় চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল।'  
'আজ আবার গাড়ি আটকেছেন। ইউ আর এ পাবলিক নুইসেন্স। পুলিশের উচিত আপনাদের সম্পর্কে খোঁজখবর করা।'

ব্যাঙাটি শুকনো গলায় বলল, 'স্যার আপনি কিছু মনে করবেন না। আমরা হেঁটে হেঁটে অতীশ দীপংকর রোডে চলে যাব। হাঁটাটা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল। আপনি চলে যান, আপনাকে শুধু শুধু দেরি করিয়ে দিলাম। আমরা দুই বন্ধুই আন্তরিক দুর্গবিত। আওয়ার এপলজি।'

এপলজিতে কাজ হল না। রমনা থানার সেকেন্ড অফিসার বিরসমুখে আমাদের হাজতে ঢুকিয়ে দিলেন। এছাড়া তার উপায়ও ছিল না। যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এসেছেন তিনি এক প্রতিমন্ত্রীর শালা। মন্ত্রীর শালাদের ক্ষমতা মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। মন্ত্রী তার পাঞ্জেরো গাড়ি নিয়ে যত যুরেন—তার শালা তার চেয়ে বেশি যুরেন। এটাই নিয়ম।

ব্যাঙাটি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। তার করুণ মুখ দেখে মায়া লাগছে। কেঁদেটেনে ফেলবে কিনা বুঝতে পারছি না। সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত এটাই তার প্রথম হাজত বাস।

ব্যাঙাটি হতভম্ব গলায় বলল, 'দোস্ত, সর্বনাশ হয়ে গেলে তো।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'সর্বনাশের কি আছে?'

'তোমার ভাবী যখন স্তনবে আমি হাজতে তখন অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পারছেন না?'

'ভাবী খুশিও হতে পারে। হাজতে থাকা মানে বাওয়া-দাওয়া বন্ধ। ভাবীর তো খুশি হবারই কথা।'

'হাজতে বাওয়া-দাওয়া বন্ধ মানে? এরা খেতে দেয় না?'

'পার হেড এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা বাজেট। এই টাকায় কি খাবি? এর আগে একবার হাজতে আমি সারাদিনে একটা কলা খেয়েছিলাম। অবশ্যি বেশ বড় সাইজ কলা।'

'তুই কি এর আগেও হাজতে ছিলি নাকি?'

'ধাক্কি মাঝে মধ্যে।'

'কি সর্বনাশ বলিস কি? তোর সঙ্গে মেশা, তো ঠিক হয়নি।'

'এবার ছাড়া পাবার পর আর মিশিস না।'

'ছাড়া পাব কিভাবে?'

'আম্মীয়-স্বজনের মধ্যে পুলিশের বড় কর্তা, কিংবা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কেউ আছে?'

'না।'  
 'মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর শাপাদের কারোর সঙ্গে মহাশয় আছে?'  
 'তোমার ভাবী থাকতে পারে। আমার নেই।'  
 'শেখ হাসিনা, কিংবা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে পরিচিত কেউ কি আছে যে তোকে চেনে।'  
 'আমার জানা মতে নেই। তবে তোমার ভাবী থাকতে পারে। ওর কানেকশন ভাল।'  
 'তাহলে টেলিফোন করে ভাবীকে বল। ভাবী একটা-কিছু ব্যবস্থা করবে।'  
 'সর্বনাশ তোমার ভাবীকে জানানোই যাবে না। আমি হাজতে আছি ওনলে কারবালা হয়ে যাবে। পুলিশ খুঁজে ঘূষ ঝায়। এরা খাবে না?'  
 'প্রতিমন্ত্রীর শাপা এসে আমাদের দিয়ে গেছে তো-পুলিশ এখন আর ঘূষ খাবে না। তবে আমাদের নিছক থেকেই উচিত পান খাওয়ার জন্যে তাদের কিছু দেয়া। মারের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই দিতে হবে।  
 ব্যাঙাচি আঁতকে উঠে বলল, 'মারবে নাকি?'  
 'মারবে তো বটেই। কথা বের করার জন্যে মারবে। ইস্টারোগেশনের টাইমে হেভি খোলাই দিতে পারে। তোমার সঙ্গে কথা বলছে, কথা বলছে—যাভাবিক ভাবেই বলছে, আচমকা গদাম করে ডলপেটে এক ঘুষি।'  
 'বলিস কি? ইস্টারোগেশন কখন হবে?'  
 'ওলি সাহেবের সময় হলেই হবে। যত দেরিতে উনার সময় হয় ততই ভাল। এত দুর্ভাগ্য করে লাভ নেই। ঘুমিয়ে থাক।'  
 'হিমু!'  
 'কা।'  
 'দেখ, তুই কিছু মনে করিস না। তোকে একটা সত্যি কথা বলি। তোমার সঙ্গে মেশা আমার ঠিক হয়নি। বিরাট ভুল হয়েছে। খেট মিসটেক। তোকে ভাল মানুষের মত দেখালেও তুই আললে ডেঞ্জারাস।'  
 'আর মিশিস না।'  
 'মিশিস না বললেই তো হবে না। তুই আমার বাল্যবন্ধু।'  
 'বিপদের সময় বাল্য-বন্ধু, বৃদ্ধ-বন্ধু কোন ব্যাপার না।'  
 'এটাও ঠিক বলেছিল। দেখ, এখানে বাথরুমের কি ব্যবস্থা? আমার টেনশানে বাথরুম পেয়ে গেছে।'  
 'হোট বাথরুম হলো এক কোণায় বসে পড়। হাজতের সেলে হোট বাথরুম করা যায়। কেউ কিছু বলে না। বড়টা হলো সমস্যা আছে।'

৭২

'তাহলে তো আপনি আত্মীয়ের মধ্যেই পড়েন। কখনো কনভিকশন হয়েছে?'  
 'জি না। হাজত থেকেই ছাড়া পেয়ে গেছি।'  
 'এইবার পাবেন না। এইবার জেলখানার ল্যাপসি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে।'  
 'জি অস্বী।'  
 'মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে মজা পাচ্ছেন। মজার ইংরেজী জানেন?'  
 'জানি স্যার—ফন।'  
 'এইবার আপনার ফনের ব্যবস্থা করে দেবে। গাড়ি ভাঙতে খুব মজা লাগে?'  
 'স্যার, আপনার সামান্য ভুল হয়েছে। আমি গাড়ি ভাঙিনি। অতি ভদ্রভাষায় লিফট চেয়েছিলাম। উনি লিফট দেয়ার নাম করে খানায় নিয়ে এসেছেন।'  
 'তাই নাকি?'  
 'জি স্যার, এটাই ঘটনা। বাংলাদেশ পেনাল কোডে — কথা দিয়ে কথা না রাখার কি কোন শাস্তি আছে? যদি থাকে তাহলে তাঁর শাস্তি পাওয়া উচিত।'  
 'আপনি কি নিজেই অতিরিক্ত চালাক ভাবেন?'  
 'জি না, ভাবি না। তবে স্যার, সত্যি কথা বলতে কি — আমি যেমন নিজেই চালাক ভাবি না — অন্যকেও ভাবি না।'  
 'আপনি কার গাড়ি ভেঙেছেন সেটা জানেন?'  
 'স্যার, আমি কারোর গাড়ি ভাঙিনি। তবে যিনি গাড়ি ভাঙার কথা বলছেন তিনি ক্ষমতাবান মানুষ মন্ত্রীর শ্যালক। এই তথ্য জানি।'  
 'তিনি এক আই আর করে গেছেন— আপনি এবং আপনার বন্ধু মিলে তাঁর গাড়ি ভেঙেছেন। এবং আগে একদিন তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন। খান ইট দিয়ে তাঁর মাথা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন।'  
 'খান ইট দিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেবার কথাটা সত্যি না হলেও ভয় দেখাবার ব্যাপারটা সত্যি।'  
 'ভয় কিভাবে দেখিয়েছেন?'  
 'ভেঙেচি কেটেছি। বাচার কাউকে ভেঙেচি দিলে ভয় লাগে না। কিন্তু বড় কোন মানুষ ভেঙেচি কাটলে বুকে ধাক্কার মত লাগে। কিভাবে ভেঙেচি কেটেছিলাম সেটা কি স্যার ডেমনস্ট্রেট করে দেখাব?'  
 'অবশ্যই দেখাবেন। আপনার মত ফাঙ্কিলদের কি চিকিৎসা আমরা করি সেটা আগে একটু ডেমনস্ট্রেট করে দেখাই। প্রথমে আমাদের ডেমনস্ট্রেটশন, তারপর আপনারটা।'

৭৪

'কি সমস্যা?'  
 'সেন্সিটিকে ডাকতে হবে। তার যদি দয়া হয় বাথরুম নিয়ে যাবে।'  
 'দয়া না হলে?'  
 'দয়া না হলে দয়া তৈরি করার সিস্টেম আছে। টাকা দিলেই দয়া তৈরি হয়।'  
 'আমাদের সঙ্গে তো টাকা নেই।'  
 'তোমার কি বড়টা পেয়েছে?'  
 'হ্যাঁ সকালবেলা বাউলস ক্রিয়ার হয়েছে— এখন এই টেনশানটায় সিস্টেমে গুণগোল— আগামীকাল সকালে যেটা হবার কথা সেটা এখন হতে চাচ্ছে। দেখুন কি করব?'  
 'দেখি, সেন্সিটিকে ডাকি।'  
 'যদি সেন্সিটিকে না হয়? দেখুন আমার পানির পিপাসাও পেয়েছে। এখানে পানি খাবার সিস্টেম কি?'  
 'বাথরুমে যখন নিয়ে যাবে ঐ সময় পানি খেয়ে নিবি। উটের মত বেশি করে খাবি। যাতে জমা করে রাখতে পারিস। আবার পানি খাবার সুযোগ কখন হবে কে জানে।'  
 'ব্যাঙাচি করুন চোখে তাকিয়ে আছে। তার কপাল ঘামছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। বিভ্রিভি করে কি যেন বলছে। মনে হয় কোন দোয়া-টোয়া পড়ছে। নিয়ামুল কোরানে কোন বিপদে কোন দোয়া পড়তে হয় তার বিবরণ আছে। ঝড়ের সময়ে দোয়া, আশুন লাগলে দোয়া, দামী জিনিস হারিয়ে গেলে খুঁজে পাবার দোয়া... পুলিশের হাতে পরলে কোন দোয়া পড়তে হবে সেটা নেই। থাকলে জনগণের উপকার হত।'

ওলি সাহেব প্রথমে আমাকে ডাকলেন। তাও ঠিক সন্দ্বায় আগে আগে। ভদ্রলোক গভীর প্রকৃতির। চেহারা মধুই একটা ঘূষ খাই, ঘূষ খাই ভাব। মাঝে মাঝে জিব বের করে ঠোঁট চাটেন। চাটা দেখে মনে হয় ঠোঁটে অদৃশ্য চিনি মাখানো। জিব দিয়ে সেই চিনি চেটে নিয়ে মজা করে খাচ্ছেন।  
 'আপনার নাম?'  
 'স্যার, আমার ভাল নাম হিমালয়। ডাক নাম হিমু।'  
 'হাজতে এই প্রথম এসেছেন, না এর আগেও এসেছেন?'  
 'এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি।'

৭৩

'আপনাদের কর্মকাণ্ড শুরু হবার আগে আমি কি একটা কথা বলতে পারি?'  
 'পারেন।'  
 'আপনার বোধহয় মনে আছে যে, আপনাকে আমি শুরুতেই বলেছি, আমি এর আগে বেশ কয়েকবার হাজতে এসেছি। প্রতিবারই ছাড়া পেয়েছি। কোন কনভিকশন হয়নি। তা থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, আমিও ক্ষমতাবান একজন মানুষ। মন্ত্রীর শাপার চেয়েও আমার ক্ষমতা বেশি। কাজেই আপনি যা করবেন ভেবেচিন্তে করবেন। ইংরেজী ঐ বাক্যটা আশা করি আপনি জানেন —  
 Look before you leap.  
 ঝাঁপ দেবার আগে ভাল করে দেখ। একবার ঝাঁপ দিয়ে ফেললে কিছু সমস্যা।  
 ওলি সাহেব জিভ চাটা বন্ধ করেছেন। শুরু চোখে তাকাচ্ছেন। ভেতরে একটু যে ধমকে গেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কাজেই এই সুযোগটা নিতে হবে। ওলি সাহেবকে উড়কে দিতে পারলে কিল-খাণ্ড থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়া যাবে।  
 'আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনি একজন বিগ শট?'  
 'জি না, আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী — ভেরী খল শট। জীবাণু টাইপ। আমার পাঞ্জেরো গাড়ি নেই, মন্ত্রী দুলাভাই নেই— এবং পায়ে জুতা পরণ্ড নেই। যদি কিছু মনে না করেন— কবীরের একটা পৌহা আপনাকে ওনতে পারি?'  
 'কারে কি ওনতে চাচ্ছেন?'  
 'কবীরের পৌহা — কবীর বলছেন,  
 হরি নে আপনা আপ ছিগায়।  
 হরি নে নফীজ কর দিখরায়।—  
 'এর মানে কি?'  
 'এর মানে হচ্ছে, ঈশ্বর আপনাকে আপনি শুকিয়ে রাখেন আবার কি অদ্ভুত সুন্দর করেই না নিজেই প্রকাশিত করেন।'  
 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এই যে লাইন দু'টা বললেন— এর মানে কি?'  
 'মানে তো আপনাকে বললাম।'  
 'ব্যাখ্যা করেন।'  
 'ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে।'  
 'কত সময় লাগবে?'  
 'দুই তিন দিন সময় লাগবে। এক কাজ করুন, আমাকে দুই তিন দিন হাজতে রেখে দিন। আমি লাইন দু'টার ব্যাখ্যা করব। তবে একটা শর্ত আছে।'

৭৫

'কি শর্ত?'

'আমার বন্ধুকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'ও আচ্ছা!'

'ও আচ্ছা বদার দরকার নেই। মঞ্জীর শালাবাবুর কাছে অপরাধ যা করেছে আমি করেছি। আমার বন্ধু করেনি। শুকে ছেড়ে দিন— আপনার লাভ হবে।'

'কি লাভ হবে?'

'সেটা যথাসময়ে দেখবেন। লাভ—লোকশান প্রসঙ্গে কবীরের একটা দোহা আছে বলব?'

'দোহা ফোহা বাদ দিন। খেড়ে কাশন। আপনি কে ঠিক করে বলুন? আপনার ব্যাক ঘাউভ কি? আপনি করেন কি?'

'আমি স্যার কিছুই করি না। হলুদ পাঞ্জাবী পরে পথে পথে হাঁটি।'

'আপনার চলে কি ভাবে?'

'এত বড় একটা শহরে একজন মানুষের বেঁচে থাকা কোন কঠিন ব্যাপার না।'

'পথে পথে ঘুরেন কেন?'

'আমার বাবার জন্যে পথে পথে ঘুরি। আমার বাবার মাথা ছিল খারাপ। বাইরে থেকে কেউ বঝতে পারত না। তাঁর সমস্ত আচার-আচরণ ছিল শাভাবিক মানুষের মত। শুধু চিন্তা ভাবনা ছিল পাগলের মত।'

'কি রকম?'

'তাঁর ধারণা হল— যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পাঠিয়ে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানানো যায়, ডাক্তারী স্কুলে পাঠিয়ে বানানো যায় ডাক্তার, তাহলে মহাপুরুষ বানানোর স্কুলে পাঠিয়ে ছেলেকে কেন মহাপুরুষ বানানো যাবে না।'

'মহাপুরুষ বানানোর স্কুল আছে নাকি?'

'জ্বি না, বাবা একটা স্কুল দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আর আমি তাঁর ছাত্র। প্রথম এবং শেষ ছাত্র।'

'স্কুলে কি শেখানো হত?'

'নির্দিষ্ট কোন সিলেবাস ছিল না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মাথায় যখন যা আসত তাই ছিল পাঠ্যক্রম। একটা উদাহরণ দেই। আমি অন্ধকারে ভয় পেতাম। সেই ভয় কাটানোর জন্যে তিনি একদিন একরাতে আমাকে বাধকরমে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। আমার বয়স তখন সাত।'

'বলেন কি, এ তো পাগলের কাজ।'

'আগেই তো বলেছি বাবা পাগল ছিলাম।'

'আপনার মা বাধা দেননি?'

'মা যাতে বাধা দিতে না পারেন সেই জন্যে মাকে মেরে ফেলেছিলেন। বাবার ধারণা মাতৃস্নেহ মহাপুরুষ হবার প্রক্রিয়ায় বড় বাধা। মহাপুরুষকে সব রকম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। স্নেহের বন্ধন, মায়ার বন্ধন, ভালবাসার বন্ধন।'

'আই সি। বাবার ট্রেনিং এর ফলে আপনি কি মহাপুরুষ হয়েছেন?'

'জ্বি না। মনে হয় পাশ করতে পারিনি। ফেল করেছি। তবে.....'

'তবে আবার কি?'

'লোকজনদের খানিকটা বিভ্রান্ত করতে পারি। এটা মহাপুরুষদের একটা লক্ষণ। মহাপুরুষদের কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। সত্যি করে বলুন তো স্যার আপনি কি বিভ্রান্ত হননি?'

'আমি বিভ্রান্ত হয়েছি?'

'জ্বি হয়েছেন। আপনার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। আপনি ভাবছেন— হলুদ পাঞ্জাবী পরা এই লোকটা মহাপুরুষ হলেও তো হতে পারে। আপনার মন দুর্বল বলেই সন্দেহটা প্রবল।'

'আমার মন দুর্বল?'

'জ্বি স্যার— যুগ যারা খায় তাদের মন দুর্বল থাকে।'

'আই সি।'

'আপনি কি স্যার দয়া করে আমার বন্ধুকে ছেড়ে দেবেন?'

ওসি সাহেব বেশ কিছুক্ষণ বিম্ব ধরে রইলেন। এক সময় তাঁর বিম্ব কাটল। তিনি মিনিট তিনেক পা নাচালেন। মানুষ সাধারণত একটা পা নাচায়— উনি দু'টা পা এক সঙ্গে নাচাচ্ছেন। দেখতে ভাল লাগছে। পা নাচানো থামল। ওসি সাহেব গভীর গলায় বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে যান— আপনার বন্ধুকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি কিছু আছেন।'

'অবশ্যই আছি। আপনাকে কবীরের দুই লাইনের ব্যাখ্যা না দিয়ে আমি যাব না।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি চা খাব এবং একটা সিগারেট খাব। স্যার আরেকটা কথা, হাজতে ঢুকানোর পর কি একটা টেলিফোন করার সুযোগ পাওয়া যায় না। আত্মীয় - স্বজনকে জানানো যে, দয়া কর, দৃষ্টিভ্রান্ত কর— আমি হাজতে আছি।'

'টেলিফোন করতে চান?'

'জ্বি চাই।'

'কাকে ফোন করবেন, প্রধানমন্ত্রীকে?'

'ক্বি না স্যার, আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি। জীবাণু টাইপ। জীবাণুর চেয়েও ছোট-ভাইরাস বলতে পারেন।'

'ভাইরাস মাঝে মাঝে ভয়ংকর হয়।'

'ক্বি স্যার, তা হয়।'

'নাথার বসুন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।'

'মন্ত্রী সাহেবের শালার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। উনার টেলিফোন নাথার তো আপনি রেখে দিয়েছেন। তাই না?'

'টেলিফোনে কি বলবেন?'

'সেটা এখনো ঠিক করিনি। বাংলাদেশ আইনে আমি হাজত থেকে একটা টেলিফোনের সুযোগ পাই। সেই সুযোগ ব্যবহার করতে চাচ্ছি।'

'আচ্ছা দেখি — উনি কথা বলতে চান কিনা কে জানে।'

ওসি সাহেব নিচু গলায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আমার সম্পর্কে কিছু বলেন বোধহয়। তারপর টেলিফোন আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি আনন্দিত গলায় বললাম— 'কেমন আছেন তাই। আমি হিমু।'

'কি চান আমার কাছে?'

'আমি আল্লাহর কাছেই কিছু চাই না, আর আপনার কাছে কি চাইব?'

'বড় বড় কথা শিখেছেন। মুখের চেয়ে জিহ্বা বড়। জিহ্বা এখন সাইজ মত কাটা পড়বে।'

'স্যার আপনার বৃকের ব্যাধিটার খবর কি শুরু হয়েছে?'

'তার মানে?'

'আমি একজন মহাপুরুষ টাইপ জিনিস। আপনি আমার নামে মিথ্যা ভাইরী করেছেন। তার শক্তি হিসেবে আপনার বৃকে ব্যাধি শুরু হবার কথা। এখনো হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না।'

'চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব হারামজাদা।'

'স্যার, ব্যাধিটা খুব বেশি হলে দেরি না করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চলে যাবেন। এনজিই ট্যাবলেট আনিয়া রাখুন। জিডের নিচে দিতে হবে।'

টেলিফোনের ওপাশে ভদ্রলোক রাগে থর থর করে কাঁপছেন। ভদ্রলোককে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে। আমি তাঁর রাগ সম্পূর্ণ অধায্য করে হাসিমুখে বললাম, 'আমার নামে মিথ্যা এফ আই আর করিয়েছেন— এটা ঠিক হয়নি। বৃকের ব্যাধি উঠামার ধানায় ওসি সাহেবকে সত্যি কথাটা জানাবেন। ব্যাধি কমে

যাবে। আপনার দুলাভাই মিথ্যা বললে কোন সমস্যা না, তিনি মন্ত্রী মানুষ। মিথ্যা তিনি বলবেন না তো কে বলবে? তিনি সত্যি কথা বললেই সমস্যা।'

'সত্যি কথা বললে সমস্যা মানে?'

'মন্ত্রী মিথ্যা বলেন এটা ধরে নিয়েই আমরা চলি। এতে সিস্টেম অভ্যন্তর হয়ে গেছে। কাজেই হঠাৎ একজন মন্ত্রী যদি সত্যি কথা বলা শুরু করেন তাহলে সমস্যা হবে না?'

'ফর ইওর ইনফরমেশন — আমার দুলাভাই কখনোই মিথ্যা বলেন না। এমপিরা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি পায় আপনি বোধহয় জানেন। সংসদে সব এমপিরা কোন বিষয়েই একমত হন না, শুধু ট্যাক্স ফ্রি গাড়ির বিষয় ছাড়া। সেখানে আমার দুলাভাই ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি নেননি।'

'আমি যে গাড়িতে চড়তে চাইলাম সেটা তাহলে কার?'

'আমার।'

'স্যার আপনি কি করেন?'

'ব্যকলা।'

'গার্মেন্টস?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আপনাদের গার্মেন্টসে কি হলুদ পাঞ্জাবী হয়? আমাদের দু'টা হলুদ পাঞ্জাবী দিতে পারবেন? একটা আমার জন্যে, একটা ওসি সাহেবের জন্যে। আমার সাইজ টোমিশ। ওসি সাহেবের ছয়ত্রিশ। এঞ্জটা লার্জ কিনলেই হবে।'

বট করে শব্দ হল। ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। ওসি সাহেব চিন্তিত এবং বিরক্তমুখে বললেন, আপনি শুধু যে নিজে বিপদে পড়েছেন তা না। আপনি তো মনে হয় আমাকেও বিপদে ফেলেছেন। অনেক টাকা—পরিসা খরচ করে চাকায় পোস্টিং নিয়েছি— বিরাট ইনভেস্টমেন্ট। ইনভেস্টমেন্টের দশ ভাগের এক ভাগও এখনো তুলতে পারিনি। এর মধ্যে যদি বদলি করে দেয় তাহলে আম-ছালা সবই যাবে। শুধু পড়ে থাকবে আমার আঁটি। ভাল কথা, ভদ্রলোকের বৃকে কি সত্যি ব্যাধি উঠবে?'

'ক্বি উঠবে। আমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জন্যে না। এমিডেই উঠবে। মানসিক ভাবে দুর্বল তো তার জন্যে মনে একটা চাপ আছে। এ চাপ শরীরে চাপ ফেলবে। বৃকে তীব্র ব্যাধি হবে। এও হতে পারে— ব্যাধি ট্যাখা কিছু হন না, কিন্তু মনে হবে ব্যাধি হচ্ছে। স্যার, আমার বন্ধুকে ছাড়ার ব্যবস্থা করবেন না?'

'করছি। সিগারেট যাবেন?'

'ক্বি খাব।'

ব্যাঙটি বিশ্বাসই করছে না যে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। সে একই সঙ্গে আনন্দিত এবং দুঃখিত। তাকে ছেড়ে দিচ্ছে এই আনন্দ তার রাখার জায়গা নেই। আবার আমাকে আটকে রেখেছে এই দুঃখেও সে আসলেই বিপর্যস্ত।

'দোস্ত তোকে রেখে চলে যেতে খুবই খারাপ লাগছে।'

'আমাকে তো রেখে যেতেই হবে। আমি দোষ করেছি পিসি পার্টি। তুই তো দোষ করিসনি।'

'তা ঠিক। তোর ভাবীর অনেক বড় বড় আখীর-বজন আছে। তাদের ধরলেই তোর রিলিঞ্জের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু তোর ভাবীকে কিছুই বলা যাবে না। বুদ্ধিমতী মেয়ে তো, তোর কথা বললেই সে বলবে — তোমার বন্ধু হাজতে সেই খবর তোমাকে কে দিল? আমি তার জেরার মুখে পড়ে স্বীকার করে ফেলব যে আমিও হাজতে ছিলাম। দাবানল লেগে যাবে, বুঝলি।'

'বুঝতে পারছি।'

'শোন দোস্ত। তুই আশা ছাড়িস না, আমি ধর্মীয় লাইনে চেষ্টা করব। আমাদের বাড়ির পাশেই এক হাফেজ সাহেব আছেন। এক হাজার টাকায় কোরান খতম দেন। আর্জেন্ট ব্যবস্থাও আছে। খুব ইমার্জেন্সি হলে মাদ্রাসার ভালেবুল এলেমদের নিয়ে চার ঘন্টায় খতম শেষ করে দোয়া করে দেন। দোস্ত তোর জন্যে এক্সটা ফি দিয়ে আর্জেন্ট দোয়া করাব। ইনশাআল্লাহ্ আমি কথা দিলাম। আর আমি রোজ এসে তোর খোজখবর করব। টিফিন কেরিয়ারে করে খাওয়া নিয়ে আসব। প্রমিজ।'

'কিছু আনতে হবে না।'

'অবশ্যই আনতে হবে। তুই না খেয়ে থাকবি? দোস্ত মনে ভরসা রাখ— কাল সকালের মধ্যে খতম স্টাট হবে। ইনশাআল্লাহ।'

আমাকে হাজতে থাকতে হল তিনদিন। ওসি সাহেবের সঙ্গে এই তিনদিন আমার কথা হল না। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। কোন একটা ঝামেলা হয়েছে — দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাই তাকে ছোট্টাছুটি করতে হচ্ছে। এই তিনদিনে ব্যাঙটির কোন খোজ নেই। তার টিফিন কেরিয়ার নিয়ে আসার কথা।

চতুর্থ দিন সকালে ওসি সাহেব আমাকে ছেড়ে দিয়ে ক্লাস্তমুখে বললেন, যান, চলে যান।

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। গত পরশুই আপনাকে ছেড়ে দেবার কথা। আমি অপারেশনে যাবার আগে সেকেন্ড অফিসারকে বলে গিয়েছিলাম আপনাকে ছেড়ে দিতে। সে তুলে গেছে। কিছু মনে করবেন না — দু'দিন এক্সটা হাজতবাস হল।'

'আপনাকে কবীরের দৌহার ব্যাখ্যাটা জো বলা হল না।'

'ব্যাখ্যা বাদ দেন। আমার জ্ঞান নিয়ে টানাটানি। খুব সমস্যায় আছি। এক কাপ চা খান— চা খেয়ে চলে যান। মনে কোন কষ্ট পুবে রাখবেন না। প্রতিমন্ত্রী শালা টেলিফোন করে আমাকে বলেছেন যে, তিনি দুঃখিত — এই খবরটা যেন আপনাকে দেয়া হয়। আমি দিলাম। কাজেই আমার দায়িত্ব শেষ।'

'উনার কি ব্যথা উঠেছিল?'

'ব্যথার খবর জানি না। উঠেছে তো বটেই। হাসপাতাল থেকে টেলিফোন হয়েছে। পলা চিটি' করছে। আপনি ইস্টারেঞ্জিং করেটর।'

'থাকুক য়ু।'

আমি ওসি সাহেবের সঙ্গে চা খেলাম। ওসি সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, মনটা খুবই খারাপ। মনে হয় আমাকে বদলি করে খাগড়াছড়ি-টরির দিকে পাঠাবে। শান্তি বাহিনীর জন্যে খাব।

'শান্তি চুক্তি তো হয়ে গেছে, এখন আর কিসের উলা?'

'এখনকার উলা হবে আপোসের উলা। শান্তি শান্তি ভাবে হাসতে হাসতে উলা। যাই হোক, বাদ দেন। চায়ের সঙ্গে কিছু খাবেন?'

'একটা সিগারেট খাব।'

ওসি সাহেব সিগারেট দিলেন। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরতে এসেছেন। বাতাসের জন্যে ধরতে পারছেন না। বাতাসে লাইটারের আগুন নিতে যাচ্ছে। তিনি মহা বিরক্ত। আমি ওসি সাহেবকে বললাম, একটা মজার কথা কি জানেন ওসি সাহেব! ছোট্ট আগুনের শিখা বাতাসে নিতে যায়। কিছু বিশাল যে আগুন, যেমন মনে করুন দাবানল, বাতাস পেলে ফুলে-ফেঁপে উঠে।

ওসি সাহেব বললেন, এটাও কি কবীরের দৌহা?'

'জ্বি না, এটা হিমুর দৌহা।'

'হিমুটা কে?'

'আমিই হিমু।'

'ও আচ্ছা, আপনি হিমু। একবার বলেছিলেন। তুলে গিয়েছি। কিছু মনে থাকে না। এমন এক বিপদে আছি যা বলার না। কারো সঙ্গে পরামর্শও করতে পারছি না। এটা এমনই এক সেনসেটিভ ইস্যু যে পরামর্শও করা যাচ্ছে না। ইয়ে ভাল কথা, আপনি পরামর্শ কেমন দেন?'

'খুবই খারাপ পরামর্শ দেই। আমার পরামর্শ যে শুনবে তার অবস্থা কাহিল।'

'তনি আপনার পরামর্শটা।'

'ঘটনা না শুনে পরামর্শ দেব কিভাবে।'



ওসি সাহেব গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, একটা রেপ হয়েছে। অল্প বয়েসী একটা মেয়েকে তার স্বামীর সামনে তিন মস্তান রেপ করেছে। মস্তান তিনটার আবার খুব ভাল পলিটিক্যাল কানেকশন আছে। মেয়ে এবং মেয়ের স্বামী এদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

'আপনাকে চাপ দেয়া হচ্ছে মামলা ভুল করে দিতে?'

'এটা করলে তো ভালই ছিল। মামলা নষ্ট করা কোন ব্যাপারই না। আমাদের বলা হচ্ছে এই তিনজনের জায়গায় অন্য তিনজনের নাম ঢুকিয়ে দিতে। এটা কি করে সম্ভব বলেন?'

'সম্ভব না কেন? মেয়ে যে তিন নাম বলছে সেই তিন নাম না গিখে আপনি লিখবেন অন্য তিন নাম। ঐ তিনজনকে ধরে এনে রাম ছাচা। ব্যাটা তোরা কেন রেপ করলি না? অন্যরা রেপ করে চলে গেল তোরা ছিলি কোথায়?'

'রসিকতা করছেন না? করেন, রসিকতা করেন। আমরা নষ্ট হয়ে গেছি। আমাদের নিয়ে তো রসিকতা করবেনই। যারা আমাদের নষ্ট করল তাদের নিয়ে রসিকতা করার সাহস আছে? নেতাদের হাত থেকে দেশটাকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের হাতে দেন— তারপর ...'

ওসি সাহেব হুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, ওসি সাহেব একটা কাজ করলে কেমন হয়?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, কি কাজ?

'আপনি সত্যি আসামীদের ধরে সেই ডায়েই কেইস সাজিয়ে দিন। নিরপরাধ তিনজনকে শাস্তি দেবেন সেটা কেমন কথা?'

ওসি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, পাগলের মত কথা বলবেন না। দেশের পরিস্থিতি বিচার করে কথা বলবেন। হাই লেভেল থেকে যেটা চাওয়া হয় সেটাই করতে হবে।

'আপনি যখন সত্যি কাজটা করবেন তখন আপনি হাই লেভেলে চলে যাবেন। বাকি সবাই চলে যাবে লেভেলে।'

'আপনি বিদায় হোন। নিন, এ সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে দিন। মুন্সের টাকায় কেনা। অসুবিধা নেই তো?'

'কেন অসুবিধা নেই!'

আমি ধান থেকে বের হলাম। ওসি সাহেবও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলেন। তাকে খুব চিন্তিত লাগছে। তার চেহারা থেকে ঘুষ খাই, ঘুষ খাই ভাবটা চলে গেছে।

৮২



বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে তামান্নার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। সেটা ঠিক হবে কি? খাল কেটে হাল্লর নিয়ে আসা হবে না তো। ফ্ল্যাটবাড়িওলিতে অবধারিতভাবে কিছু নিকর্মা বডি বিভাগ থাকে। তারা কারোর শালা, কারোর খালতো ডাই। এদের প্রধান কাজ ফ্ল্যাটবাড়ির পবিত্রতা রক্ষা করা। কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে ইটিস-পিটিস করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা, সন্দেহভাজন কেউ ঘুর ঘুর করছে কিনা তাও নজরে রাখা। বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে বসে থাকা অবশ্যই সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের তেতর পড়ে। তামান্নার মা-বাবাই জানালা দিয়ে হাত ইশারা করে কাউকে ডাকিয়ে আনতে পারেন।

পানির তৃষ্ণা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। কলিবেল টিপে পানি খেতে চাইলে কেমন হয়? একবার পানি চাইলে দরজা খুলতেই হবে। তৃষ্ণার্তকে পানি দেবে না এমন বাঙালি মেয়ের এখানে জন্ম হলি। রোজহাশরের ময়দানে সূর্য চলে আসবে মাথার এক হাত উপরে। তৃষ্ণায় তখন বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইবে। তখন শুধুমাত্র তাদেরকেই পানি পান করানো হবে যারা তৃষ্ণার্তকে পানি পান করিয়েছে।

আমি কলিবেলে হাত রাখলাম। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বডি বিভাগ উপস্থিত হলেন। মনে হচ্ছে তাকে খবর দিয়ে আনানো হয়েছে। সম্ভবত তামান্নার মা পেছনের বারান্দা থেকে পানের ফ্ল্যাটের মহিলায় সঙ্গে কথা বলেছেন। কারণ বডি বিভাগ শীতল গলায় বলল, রানার একটু নিচে আসেন। কুইক।

এইসব ফেরে কোন রকম তর্কবিতর্কে যাওয়া ঠিক না। আমি হাসি মুখে বডি বিভাগের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। সেখানে আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছে। অপেক্ষমান এক শুটকা যুবকই মনে হয় বডি বিভাগদের লীডার। সে জ্ঞানী টাইপ মুখ করে চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। মুখে সিগারেট। তবে সিগারেটে আশ্বন নেই। হাতে লাইটার আছে। সিগারেট এখনো ধরানো হয়নি। শুটকা তরুণ লাইটারটা এক হাত থেকে আরেক হাতে লোফোলুফি করছে।

৮৩

নিশ্চয়ই ভিসিআরে এমন কোন ছবি দেখেছে সেখানে নায়ক এইভাবে চেমানে বসে পা নাচায়, গৌটে থাকে সিগারেট। সে হাতে লাইটার নিয়ে জগলিৎ করে। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরানোর দৃশ্যটিও ইন্টারেস্টিং হবার কথা। আমি সেই দৃশ্য দেখার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

বডি বিভাগ শুটকার দিকে ডাকিয়ে বলল, মনা ভাই, ধইরা আনছি।

মনা ভাই পা নাচানো বন্ধ করে আমাকে দেখলেন। ইন্টারোগেশন পর্ব শুরু হল।

'কি নাম?'

'হিমু।'

'এখানে কার কাছে?'

'তামান্নার কাছে।'

'তামান্না কে হয়?'

'কিছু হয় না।'

'কিছু হয় না তাহলে এসেছেন কেন?'

'এখনো কিছু হয় না তবে ভবিষ্যতে হতে পারে।'

'তার মানে কি?'

'তামান্নার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে।'

মনা ভাই সঙ্গে সঙ্গে পা নাচানো বন্ধ করল। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল। সে মনে হয় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছে। হকচকিয়ে যাবার কারণে সিগারেট ধরানোর দৃশ্য তেমন জমল না।

'প্রেমের বিয়ে না এনেনজভ ম্যারেজ?'

'এনেনজভ ম্যারেজ। কথাবার্তা হচ্ছে।'

'কথাবার্তা কি পাকা হয়ে গেছে?'

'এখনো পাকেনি। বিয়ে পাকতে একটু সময় লাগে।'

'স্টেইট কথা জিক্সেন করছি, স্টেইট জবাব দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মনা ভাই বডি বিভাগকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল। তাদের সঙ্গে কানে কানে কিছু কথা হল। বডি বিভাগ অতি দ্রুত চলে গেল। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত কর্মকাত স্থগিত। মনাভাই আবাবো লাইটার নিয়ে লোফোলুফি করছেন। আমি দেখছি ইতিমধ্যে আরো কিছু উৎসাহী দর্শক উপস্থিত হয়েছে। মজাদার কিছু দেখার আগ্রহে দর্শকরা চক চক করছে। এই ফ্ল্যাটবাড়িতে মনা ভাই এর কারণে প্রায়ই মনে হয় মজাদার কিছু হয়।

৮৪

বডি বিভাগ ফেরত এল এবং আনন্দিত গলায় জানাল যে, তামান্নার মা হিমু নামে কাউকে চেনে না এবং তার মেয়ের কোন বিয়ের কথা হচ্ছে না।

মনা ভাই এর চোখ আনলে ঝলসে উঠল। সে মুখে সুকুয়া টানার মত শব্দ করল। বুঝতে পারছি আমার কাটা খাল দিয়ে হাল্লর ঢুকে পড়েছে। হাল্লরের হাত থেকে শুধুমাত্র তামান্নাই আমাকে বাঁচাতে পারে। আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, মনা ভাই, আমার বিচার যা করার তামান্না এসে করবেন। আপাতত দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখুন। যাতে আমি পালিয়ে যেতে না পারি।

'দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

'জ্বি সেটাই ভাল হবে। শুধু একটা রিকোয়েস্ট। কাউকে দিয়ে এক জপ ঠাড়া পানি আনিয়ে দিন।'

মনা ভাই বলল, 'তুমি জামাই মানুষ পানি খাবে? তোমার জন্যে সরবতের ব্যবস্থা করি। ঠাড়া সরবত।'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'জ্বি আচ্ছা।'

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

আমি ছাড়া পেলাম রাত এগারোটায়। তামান্না তার এক অসুস্থ বাঙ্কবীকে দেখতে গিয়ে ফিরতে দেরি করেছে। যে কারণে আমার রিলিজ অর্ডারেও দেরি হল। তামান্না আমাকে রিকশায় তুলে দিল এবং গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি দয়া করে আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে এইসব তুলে যান। আপনার সঙ্গে আমার কোন বিয়ের কথা হচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'তামান্না, রিকশা ভাড়াটা দিয়ে দাও। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।'

তামান্না বলল, 'রিকশা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে আমাকে তুমি করে ডাকবেন না।'

ঘরে ঢুকে চিঠি পেলাম। দু'টা চিঠি। ফাতেমা খালার ম্যানেজার লিখেছেন এবং ব্যাঙাটি লিখেছে। প্রথম পড়লাম ম্যানেজারের চিঠি।

হিমু সাহেব,

গত তিন দিনে আমি চারবার আপনার বৌজি করেছি।

আপনি কোথায় আছেন কেউ বলতে পারছে না। আপনার মেসের ম্যানেজার বলল, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া নাকি আপনার পুরানো রোগ। গত বছর একনাগাড়ে তিন মাস আপনার কোন বৌজি ছিল না।

৮৫

আমি খুবই চিন্তিত বোধ করছি। কারণ ম্যাডামের সিদ্ধান্তে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। তিনি আপনার সঙ্গে কথা না বলে যেতে পারছেন না। সিদ্ধান্তের এয়ার লাইনসের টিকিট কাটা আছে, কিন্তু আপনার কারণে কনফার্ম করা যাচ্ছে না।

যাই হোক, এই চিঠি আপনার হাতে যেদিন আসবে দয়া করে সেদিনই ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

বিনীত

রিকিউল ইসলাম।

ব্যাঙাটির চিঠিটার অর্ধেক বল পয়েন্টে লেখা। কয়েক লাইন বল পয়েন্টের কাগি ফুরিয়ে যাওয়ায় বিনা কাগিতে লেখা। তারপর লেখা পেনসিলে।

দোস্ত,

আমার উপর রাগ নিশ্চয়ই করেছিল। দোস্ত কি করব বল— থানায় যেতে পাহাসে ফুলায়নি। তবে তোর জন্যে কোরান মজিদ খতম দিয়েছি। ছুঁমাবারে ইমাম সাহেবকে বলে পেশালা দোয়া করিয়ে দিয়েছি। তুই যে হাজতে আছিস সেই কথা বলিনি। শুধু বলেছি বিপদগস্ত মমিন মুফলমান। হাজতে আছিস শুনলে মুহুট্টদের কেউ কেউ অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। বিপদগস্ত মমিন মুফলমানের জন্যে দোয়াতে কেউ আগতি করবে না।

যাই হোক, এখন আসল খবর হল তোর ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান বের করেছি। তার পিতার নাম মুফেমান — তার ঠিকানা, (এইখানে কয়েক লাইন বিনা কাগিতে লেখা)।

তোকে বাসা চিনিয়ে দেব। ভদ্রলোক মাই ডিয়ার টাইপের। অতিরিক্ত কথা বলেন। পেশায় জ্যোতিষী। মন্ত্রতন্ত্র জানেন। কবিরাজী চিকিৎসাও করেন। তিনি বলেছেন ইউনানী শায়ে মেদ-তুড়ি কোন ব্যাপার না। তোর সাথে আলোচনা করে উনাকে দিয়ে চিকিৎসা করা বিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

দোস্ত এখন বল তোর বৌজখবর না নেয়ার জন্যে তুই রাগ করিস নাই। বালাবকুর অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করে দে।

ইতি তোর বালাবকুর

আরিফুল আলম জোয়ার্দার।

ফাতেমা খালার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলাম। ফাতেমা খালা বিখিত হয়ে বললেন, 'তুই কোথেকে? এতদিন ছিলি কোথায়?' 'এতদিন না খালা, মাত্র তিন দিন।'

৮৬

'তোর জন্যে আমার সব আটকা পড়ে আছে। হোটেল রিজার্ভেশন করিয়ে ছিলাম লাষ্ট মোমেটে 'ভাও ক্যানসেল করলাম।'

'এখন আবার রিজার্ভেশন করাও।'

'ইয়াকুবের সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

'আসল লোক তো? ফলস না?'

'না ফলস না।'

'তোর খালুককে চিনতে পারল?'

'এখনো তার সঙ্গে কথা হয়নি।'

'কথা না বলে ভাল করেছিস। আগবাড়িয়ে খবর্দার তুই কিছু জিঙ্কেস করবি না। আগে ভাব দিবি। দরকার হলে রোজ যাবি। তাকে ইন কনফিডেন্স নিয়ে নিবি। পারবি না?'

'পারব।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'এখনো দেখিনি। শুধু সন্ধান বের করেছি।'

'আমি জানতাম তুই পারবি। গতকালই তামান্নাকে বলছিলাম যদি কেউ ইয়াকুবের খোঁজ-খবর করতে পারে হিমুই পারবে। ভাল কথা, লোকটা কি করে?'

'কবিরাজ।'

'কবিরাজ মানে কি?'

'অসুখ-বিসুখ হলে কবিরাজি মতে চিকিৎসা করে। তোমার গ্যাসের জন্যে এখন আর সিদ্ধান্তে যেতে হবে না। তাকে বললেই বাসক পাতার রস, তুলসি পাতার রস, হিলিঙ্গা গাছের শিকড়-ফিকড় মিশিয়ে এখন জ্বিনিস বানিয়ে দেবে যে এক ডোজ খেলেই গ্যাস হজম।'

'তুই বুঝতে পারছিস না হিমু! আমার অবস্থা ভয়াবহ। এমন গ্যাস হচ্ছে যে মাঝে মাঝে ভয় হয়, গ্যাস বেনুনের মত উপরে উঠে যাই কিনা। সিদ্ধাপুরে যে যাচ্ছি শখ করে তো যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ কবে?'

'যত ভাড়াভাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। কাল তো পারব না, দেখি পরও যেতে পারি কিনা। এর মধ্যে তুই বাসায় এসে বিশ হাজার টাকা নিয়ে যা। তোর কি ব্যাংকে একাউন্ট আছে?'

৮৭

না।

'আমি ম্যানিজারকে বলে দেব—তোকে যেন ক্যাশ দেয়। ক্যাশ দেয়ার সিস্টেম অবশি আমাদের নেই। আমাদের সব টানজেকশন হয় চেকে। চেকে টানজেকশনের বড় সুবিধা হল— একটা ডকুমেন্ট থাকে। যাই হোক, তোর জন্যে পেশালা ব্যবস্থা হবে। হিমু লোকটাকে তুই ডিটেকটিভের মত স্টাডি করবি। 'আম্বা লোকটা ম্যারিত নাকি?'

'খালা, আমি এখনো জানি না। আপনি সিদ্ধাপুর থেকে ঘুরে আসুন। ইতিমধ্যে আমি বৌজখবর নিয়ে রাখব।'

ফাতেমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, 'তুই আমাকে খুশী করেছিস — দেখিস আমিও তোকে খুশী করিয়ে দেব।'

'তামান্নাকে ভজিয়ে ভজিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে?'

'দিতেও পারি।'

খালার গলার স্বরে রহস্যের ঝিলিক।

৮৮



কুড়ি হাজার টাকা পাওয়া গেল।

একশ টাকার দু'টা বাউন্স। সবই চকচক নোট। নাকের কাছে ধরলে নেশার মত লাগে। সারাফণ ধরে রাখতে ইচ্ছা করে।

ম্যানিজার সাহেব বললেন, 'টাকাটা গুনে নি।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে গুনে বসলাম। নতুন টাকা গুনেও আনন্দ। কিছুক্ষণ গোনার পর হিসেবে গভগোল হয়ে একান্ন না সাতান্ন সমস্যা দেখা দেয়। আবার নতুন করে গোনা। অসুবিধা কিছু নেই। আমার দৌড়ে গিয়ে টেন ধরতে হবে না। এপি ঘরের হিম হিম হাওয়ায় টাকা গোনা যেতে পারে।

ম্যানিজার সাহেব বিরক্ত মুখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাকে বিরক্ত করতেও ভাল লাগছে। মানুষকে বিরক্ত করা যত সহজ মনে হয় আসলে তত সহজ নয়। বরং বেশ কঠিন। নিউরোলজীর এক অধ্যাপক বলেছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি যে সে বিরক্ত হতে খুবই অপছন্দ করে। সে আনন্দিত হতে পছন্দ করে, রাগতে পছন্দ করে, কিন্তু বিরক্ত হতে পছন্দ করে না। কোন মস্তিষ্ককে ক্রমাগত বিরক্ত করতে থাকলে হয় সে বিরক্তিকে রাগে নিয়ে যাবে, কিংবা এমন কোন ব্যবস্থা করবে যাতে বিরক্তিকর ঘটনাটায় সে মজা পায়।

'হিমু সাহেব টাকা গোনা এখনো হল না।'

'কি না। পক্ষাশ ক্রশ করার পরই বেড়াচ্ছেটা হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার কাছে দিন গুনেদি। আপনি বরং চা খান।'

'কি আম্বা।'

'কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে কি করবেন?'

'ভাবছি একটা পাথর কিনব।'

'ভাগ্য বদলানোর পাথর বু স্যাফায়ার?'

'কি না, সাধারণ পাথর। ডেসে রেল লাইনে সেয়, কিংবা বাড়ির ফাউন্ডেশনে ব্যবহার করে সেই পাথর।'

৮৯

'পাথরটার দাম কুড়ি হাজার টাকা?'

'কততে বিক্রি করবে তা তো জানি না। কুড়ি হাজার হচ্ছে আমার লাষ্ট অফার। দিলে দেবে, না দিলে নাই।'

ম্যানেজার সাহেব টাকা পোনা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'পাথরটার বিশেষত্ব কি?'

'বিশেষত্ব কিছুই নেই। পাথরের আবার বিশেষত্ব কি?'

'তাহলে কুড়ি হাজার টাকায় কিনছেন কেন?'

'শাখের জন্যে কিনছি। কিনতে পারব কিনা তাও জানি না। যার পাথর সেও শখ করে রাখছে।'

'পাথরের মালিক কে?'

'মালিকের নাম মেহকান্দর মিয়া। সে পেশায় একজন ভিক্ষুক।'

'আজই কিনবেন?'

'জি।'

'যদি কিছু মনে না করেন আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'

'কুড়ি হাজার টাকার পাথর দেখার লোভ হচ্ছে।'

'চলুন যাই।'

ম্যানেজার সাহেব টাকা গুনছেন। তারও টাকা পোনায় সমস্যা হচ্ছে। খুব সম্ভব তার মাথায় পাথর চেপে বসেছে।

ভিক্ষুক মেহকান্দর মিয়া আগের জায়গাতেই আছে। পাথরটাও ঠিক আগের জায়গায়। আমাদের দেখে এক চোখ মিট মিট করে তাকালো। আমি বললাম, 'মেহকান্দর মিয়া আমাকে চিনতে পারছেন?'

মেহকান্দর মিয়া জবাব দিল না। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আমি বললাম, 'মনে নেই ঐ যে আপনার পাথর ধাক্কা খেয়ে আংগুলে ব্যথা পেলাম।'

'জ্বা মনে আছে।'

'আজ ক'জন ব্যথা পেয়েছে?'

'তা দিয়া আফনের কি প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন কিছু নেই। কৌতূহল। তুমি বলবে না, তাই না?'

মেহকান্দর জবাব দিল না। সে এবং ম্যানেজার দু'জনই এখন তাকিয়ে আছে পাথরের দিকে। আমি বললাম, মেহকান্দর মিয়া তুমি কি এই পাথরটা আমার কাছে বিক্রি করবে? কি দাম চাও বল।

মেহকান্দর আবার আমার দিকে তাকালো। তার দৃষ্টিতে ভয় এবং সন্দেহ। আমি আবার বললাম, বল কত চাও? মেহকান্দর বিড় বিড় করে বলল, পাথর বেচুন না। আমি বললাম, সাধারণ একটা পাথর। এটা জো কোহিনুর না। আমি ভাল দাম দেব।

'কি না সাব। পাথর বেচুন না। যত দামই দেন বেচুন না।'

'আমি নগদ টাকা নাখে করে নিয়ে এসেছি। একবার হ্যাঁ বল, আমি পাথর নিয়ে বাড়ি চলে যাই।'

'এক কথা ক'বার কমু। আমি পাথর বেচুন না।'

'কেন বেচবে না।'

'আমি পাথরের দোকানদারী করি না। আমি করি ভিক্ষা।'

'শোন মেহকান্দর। কুড়ি হাজার টাকা আমার শেষ অফার। কুড়ি হাজার টাকা থেকে এক পয়সা বেশি দিতে পারব না। তুমি বিবেচনা করে দেখ। ধর, সিগারেটটা ধর। সিগারেট টান দিয়ে ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা কর।'

মেহকান্দর সিগারেট নিল। আমিই দেয়াশলাই দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। মেহকান্দর এগিয়ে গেল পাথরের দিকে। আমি বললাম, 'কি মেহকান্দর বেচবে?'

'জ্বা না।'

'আমি কিছু চলে যাব, পেছন থেকে ডাকলে লাভ হবে না।'

মেহকান্দর চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'লাখ টাকা দিলেও পাথর বেচুন না।'

আমি ম্যানেজারকে নিয়ে হাঁটা দিলাম। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকলাম— মেহকান্দর পাথরের উপর বসে আছে। সিগারেট টানছে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'ঐ পাখা বোধহয় কুড়ি হাজার টাকা মানে কত টাকা সেটাই জানে না।'

আমি বললাম, 'হতে পারে। একশ পর্যন্ত সে হয়তো গুনতেই জানে না। কুড়িতে আটকে আছে। তার কাছে একশ হল পাঁচ কুড়ি।'

'কিংবা এও হতে পারে পাথরটা ভেবেচে এটা অনেক দামী জিনিস। ফাঁকি দিয়ে তার কাছ থেকে সস্তায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'এটাও হতে পারে।'

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'আপনি কেন কুড়ি হাজার টাকায় এই পাথর

কিনতে চাচ্ছেন?’

‘আমি গম্বীর গলায় বললাম, ‘এটা সাধারণ পাথর না। খুবই রহস্যময় পাথর।’

‘কি রহস্য?’

‘সেটা তো ম্যানেজার সাহেব বলা যাবে না। শুধু বিদ্যা বা বাতেনী জ্ঞান সর্ব সাধারণের জন্যে।’

‘ভিক্ষুক মেছকান্দার মিয়া কি পাথরের রহস্যের কথা জানে?’

‘জানতেও পারে। না জানলে সে তার ডেরায় ফেরার সময় এমন একটা ভারী পাথর বয়ে নিয়ে যায় কেন? ম্যানেজার সাহেব সিগারেট খাবেন?’

‘জ্বি না, আমি ধূমপান করি না।’

‘আপনাকে খুবই বিচলিত মনে হচ্ছে। শরীরে কিছু কফিন ঢুকলে নার্ভ শান্ত হতে পারে।’

ম্যানেজার সাহেব সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরালেন। প্রথম টান দিচ্ছেন। তার নার্ভ শান্ত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ঘাড়ের রগ ফুলে উঠেছে। চোখ-মুখ শুক।



ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশও হতে পারে, আবার পঞ্চাশ পাঁচ পঞ্চাশও হতে পারে। রোদে জ্বলে যাওয়া চেহারা। মনে হয় দীর্ঘদিন ক্যানভাসারের চাকরি করেছেন— রোদে রোদে ঘুরেছেন। ক্যানভাসারদের মতই ধূর্ত চোখ। সারাক্ষণই ইদুরের মত চোখের মণি নড়ছে। চোখই বলে দিচ্ছে, মানুষটা অস্থির প্রকৃতির। গলার স্বর ভারী। আমার ধারণা, যে স্বরে উনি এখন কথা বলছেন সেই স্বরটা আসল না, নকল। বিশেষ বিশেষ কথা বলার সময় ভদ্রলোক সম্ভবত গলার স্বর কলান।

তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। গলার ভারী স্বর আরো ভারী করলেন। প্রায় ফ্যাস্ফেসে গলায় বললেন, ‘বুঝলেন ভাই সাহেব, আপনাকে একজন জন্মান্ত জোগাড় করতে হবে। তাকে দিয়ে লোকালয়ের বাইরে অমাবশ্যার রাত্রিতে একটা লাউগাছের বিচি পুঁতে হবে। বিচি পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে কুমারী কন্যার ঝতুকাদীন নষ্ট রক্ত। সেই কুমারী কন্যাকেও হতে হবে জন্মান্ত!’

‘আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, ‘আপনার দেবি জন্মান্তেরই কারবার।’

ভদ্রলোক আহত গলায় বললেন, ‘আমাকে কথা শেষ করতে দিন। মাঝখানে কথা বললে হবে কিভাবে? আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমি কথা শেষ করি তারপর বলবেন।’

‘আমি আবারো হাই তুলতে তুলতে বললাম, ‘জ্বি আচ্ছা।’

আমার এবারের হাইটা ছিল নকল। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা যে তাঁর জন্মান্ত বিষয়ক গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে না। ভদ্রলোক এই সহজ সভা ধরতে পারছেন না। তিনি গল্প শুনিয়ে ছাড়বেন।

‘এরপর আপনাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে প্রতিদিন খালি পায়ের স্নোভিনি নদী থেকে মাটির পারে এক পাত করে পানি আনতে হবে। পানি আনার কাজটা করতে হবে মধ্যরাতে।’

‘ও আচ্ছা।’

'পানি আনতে হবে উলঙ্গ অবস্থায়। তখন গায়ে কোন কাপড় থাকলে চলবে না। সেই পানি দিয়ে প্রতি রাতেই লাউ গাছের বীজ যে জায়গায় পুতেছেন, সেই জায়গাটা ভিজিয়ে দিতে হবে। যতদিন না বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম না হচ্ছে।'

আমি আশ্চর্য হুঁসুটি বললাম, 'ইস্টারেটিং!'

ভদ্রলোক আরো খানিকটা খুঁকে এলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের গলা অন্য মানুষদের গলার চেয়ে লম্বা। তাঁর শরীরটা আগের জায়গাতেই আছে কিন্তু গলা লম্বার কারণে মাথাটা এগিয়ে এসেছে।

'অঙ্কুরোদগমের পর থেকে লাউগাছে প্রথম ফুল আসা পর্যন্ত আপনাকে ঠিক সন্ধ্যাবেলা হযরত মুসা আলায়হেস সালামের মায়ের সতেরোটা নাম পড়ে গাছে ফুঁ দিতে হবে।'

'সতেরোটা নাম আমি পাব কোথায়?'

'আপনাকে আমি লিখে দিচ্ছি। এছুরি লিখে দিচ্ছি।'

'থাক, দরকার নেই।'

'দরকার নেই কেন?'

'কাগজ আমি রাখব কোথায়? আমার পাঞ্জাবীর পকেট নেই।'

ভদ্রলোক আহত গলায় বললেন, 'আপনি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঘন ঘন হাই তুলছেন। অবশ্য বিশ্বাস করা কঠিন।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'বিশ্বাস করছি। প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করছি। কারণ বিশ্বাসে মিলায় বন্ধু — তর্কে বন্ধু!'

'মন্ত্রতন্ত্রের কথা আমি কাউকে বলি না। মানুষের মনে ঢুকে গেছে অবিশ্বাস। অবিশ্বাসীদের এইসব বলে লাভ নেই। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে বলে বলছি। তাছাড়া আমি বেশিদিন বাঁচব না। সারাজীবনের সঙ্কয় কিছু মন্ত্র-তন্ত্র কাউকে দিয়ে যেতে চাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

'জ্বিনা!'

'হান, আরেক কাপ খান। চায়ের সঙ্গে কোন নাশতা দেব? মুড়ি আছে? মুড়ি মেখে দিতে বলি?'

'কুম।'

ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। আমি বসে আছি অন্ধকারে। আমার সামনে এতক্ষণ একটা হারিকেন ছিল। ভদ্রলোক ভেতরে ঢোকানোর সময় হারিকেন নিয়ে গেলেন। ঢাকায় বিখ্যাত লোড শেডিং শুরু হয়েছে। দু'ঘণ্টার আগে ইলেকট্রিসিটি আসবে না। এখন শীতকাল গরম লাগার কথা না। কিন্তু গরমে শরীর যেমে গেছে। ইলেকট্রিসিটি এলেও এই গরমের হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

কারণ বসার ঘরে ফ্যান নেই। ভদ্রলোক গল্প করার সময় প্রবলবেগে হাওয়া করছিলেন। তিনি ভেতরে ঢোকানোর সময় হারিকেনের সঙ্গে হাতপাখাও নিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকের আচার-আচরণের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে— ভেতরের বাড়িতে ঢুকলে সহজে বের হতে চান না। মুড়ির কথা বলে ভেতরে চুকেছেন, আর বের হচ্ছেন না। কখন বের হবেন কে জানে।

ইনিই আমাদের মুহাম্মদ ইয়াকুব। বাবা—সুলায়মান, ধাম—নিশাখালি, জেলা—নেত্রকোনা। ভদ্রলোক কবিরাজ হলেও কথাবার্তায় মনে হচ্ছে মন্ত্র-তন্ত্র যাদু-টোনার ব্যাগারে বিশেষজ্ঞ।

ইয়াকুব সাহেব আমাকে বানিকটা পছন্দ করেছেন বলে মনে হচ্ছে। আজ নিয়ে তার সঙ্গে আমার তৃতীয় দফা সাক্ষাৎ। এর মধ্যেই তিনি আমাকে অদৃশ্য হবার মন্ত্র শেখাচ্ছেন। অবশ্য এটা তাঁর কোন একটা কৌশলও হতে পারে। হুঁত মানুষদের নানান ধরনের কৌশল থাকে। মন্ত্র-তন্ত্রের কথা বলে আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা করছেন। আমি অভিভূত হচ্ছি না। এ ব্যাপারটাও সম্ভবত ভদ্রলোকের মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইয়াকুব সাহেব এক হাতে মুড়ির বাটি এবং হারিকেন অন্য হাতে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলেন।

'ইলেকট্রিসিটি আজ বোধহয় আসবেই না। নিন, মুড়ি খান। খেয়ে অবশ্যি আরাম পাবেন না— মুড়ি ন্যাভন্যাতা হয়ে গেছে। টিন ভাল করে বন্ধ করেনি। বাতাস ঢুকে মুড়ি মরা হয়ে গেছে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, মরা মুড়ি জীবিত করার কোন মন্ত্র নেই? মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিলেন, মুড়ি ভাজা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক দুর্গমিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি মুড়ি চাবাতে চাবাতে বললাম, 'ঠাট্টা করছিলাম।'

ইয়াকুব সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'মন্ত্র বিশ্বাস করা-না-করা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু মন্ত্র নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। মন্ত্র হল বিচিত্র ধর্মের কিছু শব্দ। শব্দ তুচ্ছ করার বিষয় নয়। আদিতে কিছুই ছিল না। আদিতে ছিল মহামুণ্ড। তারপর একটা শব্দ হল— "বিগ বেং।" তৈরি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কাজেই সৃষ্টির মূলে আছে শব্দ।

আমি বললাম, 'আপনার কাপড়ের ব্যাগে কি?'

'আপনাকে একটা জিনিস দেখাবার জন্য এনেছিলাম— মানুষের একটা কঙ্কাল, নরমুণ্ড।'

'দেখন।'  
 'আপনি অবিশ্বাসী টাইপ মানুষ। আপনাকে দেখানো না-দেখানো সমান। সত্যিকার কোন জহরীর হাতে পড়লে সে লাফিয়ে উঠত।'  
 'বিশেষ ধরনের নরমুতু?'  
 'খুব লক্ষ্য করে দেখুন, আপনার কাছে বিশেষ ধরনের মনে হয়, নাকি সাধারণ মনে হয়।'  
 আমি বিশেষ কিছু দেখলাম না। সাইকে ছোট একটা নরমুতু। ঝাল সাদা থাকে। এটা একটা কালচে হয়ে আছে— মনে হয় অনেকদিনের পুরানো।  
 'বিশেষ কিছু বুঝতে পারছেন না?'  
 'হুঁনা।'  
 'অফিকোটর দু'টা থাকে— এর যে তিনটা সেটা বুঝছেন?'  
 আমি দেখলাম কপালেও একটা ফুটো। সেই ফুটাকে অফিকোটর মনে করার কারণ নেই। হয়ত অন্য কোন কারণে ফুটো হয়েছে। কপালে গুলি খেলে কপাল ফুটো হবার কথা।  
 'আপনি বলতে চাচ্ছেন জীবিত অবস্থায় এই মানুষটার তিনটা চোখ ছিল?'  
 ইয়াকুব সাহেব নরমুতু থলিতে ভরতে ভরতে বললেন, 'সব মানুষেরই তিনটা চোখ থাকে। দু'টা দৃশ্যমান, একটা অদৃশ্য।'  
 'ও আচ্ছা।'  
 ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। আমি বললাম, 'ইয়াকুব সাহেব, আমি উঠি।'  
 ইয়াকুব সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'একদিন এসে আমার সাথে চারটা খানা খান। দরিদ্র মানুষ বেশি কিছু খাওয়াতে পারবে না। মটরগুটি দিয়ে শিং মাছের ঝোল আর ভাত। কবে খাবেন কনু।'  
 'আপামী সপ্তাহে আসি?'  
 'হুঁ আচ্ছা, আসুন।' আপনার মোটা বুককেও নিয়ে আসবেন। উনার জন্যে একটা অল্প খানি রাখবে। খেলে ক্ষুধা কমে যাবে। অতি সুখান্যও অকুচি হবে।  
 'টেবলেট জাতীয় কিছ?'  
 'হুঁ। ফার্মেসীর ট্যাবলেট না— বড়ি জাতীয়। সকাল-বিকাল দু'বেলা দেব্য।'  
 'বড়ি খেলে ক্ষিধে লাগবে না?'  
 'হুঁনা।'  
 'এই ক্ষুধা মুক্তি ট্যাবলেট তো সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্যে দরকার। তৈরি আছে? থাকলে দু'টা দিন নিয়ে যাই— টাই করে দেবি।'

'হুঁ না, তৈরি নেই।'  
 'তৈরি করে রাখুন। টেবলেটের নাম কি?'  
 'কোন নাম দেইনি।'  
 'নাম দিন ইয়াকুবের ক্ষুধামুক্তি বড়ি।'  
 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?'  
 আমি জবাব না দিয়ে হাঁটা ধরলাম। ফাতেমা খালা সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন কিনা খবর দেয়া দরকার।  
 খালা বাড়িতে নেই। তিনি তাঁর আর্কিটেক্টের কাছে গিয়েছেন। বাড়িতে যে সোয়ানা বসবে তার ডিজাইন নিয়ে কথা বলবেন। পুরানো ডিজাইন তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। ফলস সিলিং অনেক উচুতে হয়েছে। আরো নিচু হওয়া দরকার। সোয়ানার ঘরে দমবন্ধ দমবন্ধ ভাবটা আসল। তামান্না আমাকে বসতে দিল। তার আচার-আচরণ স্বাভাবিক। মনে হচ্ছে আজই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আমি চাইবার আগেই লম্বা গ্রাস ভর্তি সবুজ রঙের কি এক সরবত এনে দিল। সরবতের গ্লাসে বরফের কণা ভাসছে। আমি চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'জামান ভাল আছে?'  
 তামান্না বিধিত হয়ে বলল, 'জামান কে?'  
 'আপনার ছোট ভাই রিকশা থেকে পড়ে যে ব্যাথা পেয়েছিল।'  
 'ও আচ্ছা। হ্যাঁ, জামান ভাল আছে। তার রিকশা থেকে পড়ে ব্যাথা পাওয়ার কথা আপনাকে কে বলেছে?'  
 'আপনার ম্যাডাম বলেছেন।'  
 'যে আপনাকে যা বলে ভাই আপনি মনের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে দেন?'  
 'সবাই তাই করে।'  
 'সবাই তাই করে না। আপনি অন্য সবাইর মত না।'  
 'আমি আলাদা?'  
 'হ্যাঁ আলাদা, তবে ভাল অর্থে আলাদা না, মন্দ অর্থে আলাদা। আপনার সমস্ত জীবন এবং কর্মকান্ড জুড়ে আছে ভান। মিথ্যা রহস্যের খোঁয়া সৃষ্টি করে আপনি তার মধ্যে বাস করতে ভালবাসেন। কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে আপনি পাথর কিনতে গিয়েছিলেন। যাননি?'  
 'হ্যাঁ।'  
 'যার পাথর সে বিক্রি করল না, কারণ আপনি এমনই এক রহস্যের কুয়াশা তার সামনে তৈরি করলেন যে সে ভাল না জানি এটা কি পাথর। কাজটা

আপনি করলেন ম্যানেজার সাহেবের সামনে কারণ আপনি একই সঙ্গে তাকেও  
ভড়কে দিতে চেয়েছেন— তাই না!

'হ্যাঁ। উনি কি ভড়কেছেন?'

'যথেষ্ট ভড়কেছেন। গতকাল অনেকক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে বুলি-বুলি  
করেছেন পাথরটা দেখে আসার জন্যে।'

'আপনি কি দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'পাথরটা হাত দিয়ে ছুয়েছেন?'

'হাত দিয়ে হেঁব কেন?'

'হাত দিয়ে ছুঁলেই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হত। ইলেকট্রিক শকের মত  
একটা শক খেতেন। নেকস্ট টাইম যখন যাবেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবেন।'

তামান্না একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আরাম করে সরবত  
খাচ্ছি। সরবতে কেমন লজ্জেশ লজ্জেশ পদ্ধি। অতিরিক্ত মিষ্টি। অতিরিক্ত মিষ্টি।  
মনে হয় এই সরবতের জন্যে প্রয়োজন। মিষ্টি কম হলে ভাল লাগত না।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি!'

'পাথরটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে আমি চারশ ভেন্টের শক খাব?'

'চারশ ভেন্টের শক খাবেন না— মূহু ধাক্কার মত লাগবে।'

'আপনি আমাকে নিয়েও রহস্য তৈরি করবেন না। গ্লীজ। সরবত খাচ্ছেন—  
খান। আমি খুব দুঃখকষ্টে মানুষ হয়েছি। যারা দুঃখকষ্টে মানুষ হয় তারা এত  
সহজে বিভ্রান্ত হয় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মানুষ হিসেবে আমি কখনো বোকা  
ছিলাম না।'

আমি সরবতের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'ফাতেমা খালার ফিয়তে  
মনে হয় দেরি হবে। আমি উঠি?'

তামান্না কঠিন গলায় বলল, 'না আপনি উঠবেন না। ম্যাডাম আমাকে বগে  
গেছেন আপনি যদি আসেন আপনাকে বেন আটকে রাখা হয়। লাইব্রেরী ঘরে  
গিয়ে বসতে পারেন— বইটাই পড়লে সময় কাটবে।'

আমি বললাম, আপনার ম্যাডাম নিশ্চয়ই আপনাকে বলেননি আমাকে  
লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে বসাতে। আমার ধারণা তিনি আপনাকে বলে গেছেন আমার  
সঙ্গে গল্প-গুজব করতে। তাই না!'

'হ্যাঁ তাই। বেশ আপনি গল্প করুন, আমি শুনছি।'

'রূপকথা শুনবেন?'

'যা শুনবেন তাই শুনব।'

আমি বেশ কায়াসা করে গল্প শুরু করলাম। যে কোন কারণেই হোক  
তামান্না মেয়েটি আমার উপর অসম্ভব বিরক্ত। বিরক্তটা এই পর্যায়ে যে সে  
আমার দিকে তাকাতেও পারছে না। সে গল্প শুনছে খুবই অনাগ্রহ এবং  
অনিশ্চয়।

তিন জেলে গিয়েছে মাছ মারতে। সাগরে জাল ফেলেছে। জালে ধরা পড়ল  
এক মৎস্যকন্যা, মারমেইড। মৎস্য কন্যা বলল, 'তোমাদের আল্লাহর সোহাই  
লাগে তোমরা আমাকে মের না। আমাকে সাগরে ফেলে দাও, তার বদলে  
তোমাদের প্রত্যেকের একটা করে ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব। তবে আমি তো আর  
আলাদীনের জ্বিনের মত ক্ষমতাবান না— আমার ক্ষমতা সীমিত। আমি টাকা  
পরিসা ধনদৌলত দিতে পারব না।'

প্রথম জেলে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমার বুদ্ধি বাড়িয়ে দাও।  
এখন যে বুদ্ধি আমার আছে তা ডাবল করে দাও।'

মৎস্য কন্যা বলল, 'ডাবল করা হল।'

প্রথম জেলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝল তার বুদ্ধি বেড়েছে।

দ্বিতীয় জেলে বলল, একজন যখন বুদ্ধি নিয়েছে তখন আমিও বুদ্ধিই নেব।  
তবে ডাবল না আমার বুদ্ধি তিনগুণ করে দাও।' মৎস্য কন্যা বলল, 'তিনগুণ  
করা হল।'

তৃতীয় জেলে বলল, 'আমিও বুদ্ধিই চাই তবে চাই দশগুণ।'

মৎস্যকন্যা বলল, 'খবর্দার, এইটি করবে না। দশগুণ বুদ্ধি তোমাকে দেয়া  
হলে তুমি বিপদে পড়বে।'

'বিপদে পড়া না পড়া আমার ব্যাপার। তোমার কাছে দশগুণ বুদ্ধি চেয়েছি,  
তুমি বুদ্ধি দাও।'

'এখনো সময় আছে ভেবে দেখ।'

'ভাবাভাবির কিছু নাই।'

মৎস্যকন্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা যাও, তোমাকে দশগুণ বুদ্ধি  
দেয়া হল। আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জেলে একটা মেয়ে হয়ে গেল।

তামান্না বলল, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে  
দশগুণ বেশি?'

'হ্যাঁ।'

'এই গল্পটা কি আপনি আমাকে খুশি করার জন্যে বললেন?'

'আপনাকে খুশি করার একটা প্রচন্দ ইচ্ছা আমার ছিল তবে পল্লটা আমি বিশ্বাস করি।'

তামান্না নড়ে চড়ে বসল। এবং আমাকে হঠাৎ খুবই বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'হিমু সাহেব, শুনুন। ম্যাডাম চলে আসার আগে আপনাকে খুব জরুরী কিছু কথা বলি, দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। আপনার বুদ্ধিও মেয়েদের মতই দশগুণ বেশি। তবে এই বুদ্ধিতে কাজ হবে না। আমি আপনাকে পছন্দ করি না। আমি যাদেরকে পছন্দ করি না তাদের সে ব্যাপারটা বুঝতে দেই না। বরং এমন ভাব করি যাতে তারা বিভ্রান্ত হন। তারা মনে করেন আমি তাদের খুবই পছন্দ করি। আপনার বেলায় ব্যতিক্রম করলাম। আমি যে আপনাকে অপছন্দ করি সেটা জানিয়ে দিলাম।'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রাখলাম না।'

'আপনি আপনার ম্যাডামকে খুবই অপছন্দ করেন তাই না?'

'হ্যাঁ উনাকে অপছন্দ করি। বোকা মানুষ আমার পছন্দ না। আপনার খালা মেয়ে হয়েও বোকা। মৎস্যকন্যার গল্প আপনার খালার ক্ষেত্রে কাজ করছে না। যে কারণে আমার অপছন্দের ব্যাপারটা উনাকে জানতে দেইনি। কারণ উনার সাহায্য আমার দরকার। আমি বিশাল সংসার নিয়ে বিপদে পড়ে গেছি।'

তামান্না বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার সামনে বসে আছে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে আমাদের সামনে অদৃশ্য একটা দাবার সেট। দাবা খেলা হচ্ছে। আমি তাকে কিস্তি দিয়ে দিলাম। কিস্তি কাটান দিয়ে সে উল্টো কিস্তি দিয়েছে। ঘোড়ার কিস্তি। এক সঙ্গে রাজা এবং মন্ত্রী ধরা পড়েছে। রাজা বাঁচাতে হলে আমাকে মন্ত্রী বিসর্জন দিতে হবে। রাজা না বাঁচিয়ে মন্ত্রী বাঁচালে কেমন হয়। খেলা শেষ হয়ে যায়। তাতে কি, মন্ত্রীর মত শক্তিশালী যুটি তো বেঁচে রইল। আমি রাজা বিসর্জন দেবার ব্যবস্থা করলাম। কোমল গলায় বললাম, 'তামান্না, আপনি বোধহয় জানেন না, আমি আপনাকে খুবই পছন্দ করি। আপনার মত পছন্দ এই জীবনে আরেকটি মেয়েকে করেছিলাম তার নাম রুপা।'

তামান্না আমার কথায় মোটেই চমকাল না। সে কঠিন মুখে বলল, 'পূঁজ আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি এই দীর্ঘ জীবনে কাউকে পছন্দ করেননি। ভবিষ্যতেও কাউকে পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে কিছু কিছু খুব দুর্ভাগা মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তারা কাউকে ভালবাসতে পারে না। আপনি সেই সব দুর্ভাগা মানুষদের একজন।'

আমি বললাম, 'ও আচ্ছা।'

'আপনি মহাপুরুষ সেক্ষে পথে পথে হাঁটেন — সেটাই আপনার জন্যে ভাল।'

আমি আবারো বললাম, 'ও আচ্ছা।'

তামান্না দীর্ঘ কোন বক্তৃতার জন্যে তৈরি হচ্ছিল — নিছকে সামলে নিল কারণ ফাতেমা খালা এসে পড়েছেন। তাকে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কেমন আছেন হিমু?'

'ভলা।'

'আরো আগে চলে আসতাম, বুলবুল পাথরটার কথা বলল। ভাবলাম ঠিক আছে দেখেই যাই। পাথর দেখে এসেছি।'

'হাত দিয়ে ছুঁয়েছ?'

'হঁ। হিমু তুই বললে বিশ্বাস করবি না— হাত দিয়ে হোয়ামাত ইলেকট্রিক শকের মত শক খেলাম। মনে হল পাথরটা জীবন্ত। আমার গায়ের সব পোমা খাড়া হয়ে গেল।'

আমি তামান্নার দিকে তাকালাম। তামান্না আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কিশোরীদের মত ছটফটে গলায় বলল, 'ম্যাডাম, আপনি একা গিয়ে দেখে এলেন আমাকে নিলেন না। আমিও পাথরটা ছুঁয়ে দেখতাম।'

ফাতেমা খালা বললেন, 'পাথর গিয়ে দেখার দরকার নেই। পাথরটা আমি কিনব। যত টাকা লাগে কিনব। গাড়িতে আসতে আসতে মন স্থির করেছি। হিমু, তোর উপর দায়িত্ব হচ্ছে পাথরটা কেনার ব্যবস্থা করা। তোকে আমি তার জন্যে আলাদা কমিশন দেব। কেনার ব্যবস্থা করতে পারবি না?'

'পক্ষব।'

'বুলবুল বলছিল তুই নাকি এই পাথরটার বিষয়ে জানিস। পাথরটার ক্ষমতা কি বল দেখি।'

'খালা এটা হল ইচ্ছাপূরণ পাথর। পাথরে হাত দিয়ে যা চাইবে তাই পাবে।'

'সত্যি বলছিস, না ঠাট্টা করছিস।'

'সত্যি বলছি।'

'তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুই ঠাট্টা করছিস। ঠাট্টা করলেও কিছু যায় আসে না — পাথরটা আমার দরকার। তুই এক কাজ কর এফুনি যা পাথরটা নিয়ে আয়। পাঞ্জেরো গাড়িটা নিয়ে যা — মালিক শুদ্ধ নিয়ে আসবি। পাথরের দাম যা ঠিক হয় আমি দিয়ে দেব।'

'ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি এক কাজ করি, গাড়ি করে না হয় ইয়াকুব সাহেবকে নিয়ে আসি। পাথর আরেকদিন আনব।'

'ইয়াকুব পালিয়ে যাচ্ছে না। তুই পাথর আগে নিয়ে আয়। পাথরের সত্যি সত্যি ক্ষমতা আছে কিনা সেটা আচ্ছ রাতেই টেস্ট করব।'



আমি আড়চোখে তামান্নার দিকে তাকালাম। তার ঠোঁটের কোণায় মোনাগিন্সা ষ্টাইল হামি।

খালা তামান্নাকে বললেন, 'তামান্না তুমি একটু এই ঘর থেকে যাও। আমি হিমুকে কিছু পার্সোনাল কথা বলব।'

তামান্না চলে গেল। খালা গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে ইচ্ছা করে রেখে গিয়েছিলাম যাতে দু'জনের মধ্যে পরিচয়টা গাঢ় হয়। মেয়েটাকে কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল।'

'কি রকম সরল মেয়ে দেখেছিস? জগতের কোন জটিলতা এই মেয়ে ধরতে পারে না। আর আমাকে যে কি পছন্দ করে। আমার নিজের কোন মেয়ে থাকলে সেও আমাকে এত পছন্দ করত না। এই যে আমি তাকে ছাড়া পাথর দেখে এসেছি তার জন্যে সে কেমন মন খারাপ করে দেখেছিস? আর একটু হলে কেঁদে ফেলত। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'চোখ ছিল ছল করছিল কিনা তুই বল।'

'ছিল ছল মানে আরেকটু হলেই টপটপাঙ্গি পানি পড়া শুরু হত।'

'আমি যদি এখন তাকে বলি, তামান্না আমি চাই তুমি হিমুকে বিয়ে কর, সে কোনদিকে তাকাবে না, তুই যে একটা প্রথম শ্রেণীর ভ্যাগাবন্ড, চাকরি বাকরি নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াস এইসব নিয়েও ভাববে না। চোখ বন্ধ করে বিয়ে করবে।'

'তাহলে বলে ফেল। ফেলছ না কেন? 'ধর তজা মার পেরেক' ঝামেলা শেষ করে দাও।'

'আমি বলব না। আমি চাই মেয়েটা যেন নিজ থেকে তোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে নিজেই যদি তোকে পছন্দ করে ফেলে তাহলে আর আমাকে পরে দোষ দিতে পারবে না। আমি অবশি তামান্নার রেইন ওয়াস করে ফেলেছি— তোর সবক্ষেত্রে তোর সম্পর্কে বানিয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলি।'

'খালা মেনি গ্যাংকস।'

'তুই একটা কাজ করবি, মেয়েটাকে নিয়ে ভাল কোন রেইনরেটে খেতে যাবি। আমি খরচা দেব। মেয়েরা রেইনরেটে খেতে পছন্দ করে।'

'ভাল কোন রেইনরেটে তো খালি পায়ের আমাকে ঢুকতেই দেবে না।'

'গাধার মত কথা বলিস না তো, তোকে স্যাডেল, পাঞ্জাবী এইসব কিনে দিয়েছি না। ফিটফাট হয়ে যাবি। আরেকটা কথা, রেইনরেটের বয় বাবুর্চির সঙ্গে

রসিকতা করবি না। লোয়ার লেভেলের লোকজনদের সঙ্গে রসিকতা মেয়েরা একদম পছন্দ করে না।'

'কোথায় পড়েছ রিভার্স ডাইজেস্টে?'

'মনে নেই কোথায় পড়েছি। তুই এক কাজ কর — আগামীকালই যা।'

শুলশানে একটা রেইনরেট আছে তন্দুরী খুব ভাল করে। আমার কাছে ওদের কার্ড আছে, তোকে দিচ্ছি। একটু বোস কার্ডটা নিয়ে আসি।'

'কার্ডটা কাল নেই।'

'কাল ভুলে যাব। আজই নিয়ে যা।'

আমি তন্দুর হাউসের কার্ড এবং পাজেরো গাড়ি নিয়ে বের হলাম। ভিস্কুক মেছকান্ডর সাহেবকে পাওয়া গেল না। পাজেরো ডাইভারকে বললাম, 'চলুন শহরে ঘুরে বেড়াই। ভিস্কুক খুঁজে বেড়াই।'

পাজেরো ডাইভার খুবই বিরক্ত হল। পুরো দু'ঘন্টা শহরে ঘুরলাম। তারপর গেলাম শহরের বাইরে। সাতার স্মৃতিসৌধ দেখে এলাম। স্মৃতিসৌধ দেখা হবার পর ডাইভার বলল, 'আর কোথায় যাবেন?'

আমি বললাম, 'জাপান বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে চল। সেতুটা দেখা হয়নি।'

'গাড়িতে তেল নেই। তেল নিতে হবে। ফুয়েলের কীটা মাঝামাঝি জায়গায় আছে, সে বলছে তেল নেই। আমি মধুর গলায় বললাম, 'তেল ছাড়াই গাড়ি চলবে। আমি সাধু মানুষ, মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছি। বিনা তেলেই গাড়ি চলবে। তুমি তেল বিষয়ক কোন চিন্তাই মাথায় স্থান দিও না।'

'আপনি সত্যি সত্যি জাপান-বাংলাদেশ সেতু দেখতে যাবেন?'

'অবশ্যই। পাকিস্তান-বাংলাদেশ বৈরী সেতু থাকলে ভাল হত। সেটাও দেখে আসতাম। নাই যখন জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুই সহি।'

'চলুন।'

আমি চোখ বন্ধ করে গম্ভীর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বিড় বিড় করে গাড়ির ডেসবোর্ডে দু'টা ফুঁ দিয়ে দিলাম। ডাইভারের নিন্দায়ই পিড়ি জ্বলে গেল।

জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু দেখে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। গাড়ি যখন সঙ্গে আছে ব্যাঙটির বাসা খুঁজে বের করলে কেমন হয়। ডাইভারকে বললাম বাসাবোর দিকে যেতে। জীপের ডাইভার ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। তার পাশের সীটে বসে না থেকে আমি যদি রাস্তায় থাকতাম সে নির্দ্বয় আমাকে চাপা দিত।

'ডাইভার!'

'ফি।'

'তেল ছাড়া শুধু ফুয়ের উপর গাড়ি কেমন চলছে দেখেছ?'

'রিজার্ভে সামান্য তেল ছিল তাই দিয়ে চলেছে। আর চলবে না।'  
'চলবে না মানে? আবারো ফুঁ দিয়ে দেব — আবারো চলবে, ময়মনসিংহ থেকে ঘুরে আসতে পারব।'

'ময়মনসিংহ যাবেন?'

'জ্বি!'

'ময়মনসিংহে কি?'

'কিছু না। আমার ফুঁয়ের জোর পরীক্ষা করা।'

ডাইভার গভীর হয়ে গেল। আমি খুঁজে খুঁজে ব্যাঙটির বাড়ি বের করলাম। ছোট একতলা বাড়ি। গাছপালায় ভর্তি। আমি পাজেরো ডাইভারকে বললাম, 'বেশিক্ষণ না। আমি ঘটা খানিক থাকব — তারপর ময়মনসিংহে। তুমি অপেক্ষা কর। আমার সঙ্গে টাকা পরস্যা থাকে না, কাছেই চা খাওয়ার টাকা দিতে পারছি না। পেটল বেচে চা নাশতা করতে পার। সমস্যা নেই।'

ব্যাঙটি বাসায় ছিল না। তার স্ত্রী খুবই কৌতূহলী হয়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর সহজ গলায় বললেন, 'ভেতরে এসে বসুন। ও এসে পড়বে।'

ভদ্রমহিলা অসম্ভব রোগা। তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করছে কিংবা চশমার কাচ জ্বল জ্বল করছে। প্রফেসর গফেসর চেহারা। বয়সকালে রূপবতী ছিলেন। সেই রূপ পুরোপুরি চলে যায়নি। ভদ্রমহিলার গলার স্বর খুবই কোমল। তিনি বললেন, 'আপনার নাম হিমু?'

'জ্বি!'

'ও আপনার কথা আমাকে বলছে। আপনি নাকি গুর জ্বল জ্বল জীবনের বন্ধু। গুর কোন বন্ধু-বান্দব বাসায় আসে না। আপনাকে দেখে সেই জ্বনোই খুব অবাক হয়েছি। দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।'

আমি বসলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, 'চা দিতে বলি? চায়ে চিনি দুধ খান তো?'

'জ্বি খাই।'

ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকলেন। আমার জীবনে কোন বাড়িতে এত দ্রুত কাউকে চা দিতে দেখিনি। ভদ্রমহিলা হাসি মুখে বললেন, 'আমার ঘন ঘন চা খাবার অভ্যাস। ফ্লাঞ্জ ভর্তি করে চা বানিয়ে রাখি। সেখান থেকেই আপনাকে দিলাম।'

'থ্যাকে য়ু।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনাকে শুধু চা দিতে হল। ঘরে কোন খাবার নেই। ইচ্ছা করেই খাবার রাখি না। খাবার যেখানেই থাকুক ও খুঁজে বের করে বেয়ে ফেলে।'

আমি কিছু বললাম না। চায়ে চুমুক দিলাম। ফ্লাঞ্জে রাখা চা কখনো খেতে ভাল হয় না। এই চাটা ভাল হয়েছে।

'আপনার বন্ধুর খাই খাই স্বভাবের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় আছে। আছে না!'

'জ্বি আছে।'

'ও সবকিছু খেতে পারে। একবার বড় গ্রাসে এক গ্রাস সোয়াবিন তেল নিয়ে লবণ মিশিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। ও হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর কুস্তকর্ণ। কুস্তকর্ণ কে তা জানেন?'

'জ্বি না।'

'কুস্তকর্ণ হল রাবণের মেথো ডাই। তার মা'র নাম কৈকেয়ী। কুস্তকর্ণের ক্ষুধা কখনো মিটতো না। এমন জিনিস নেই যে সে খেতে না। সাধু সন্ন্যাসী, স্বধি সবই খেয়ে ফেলতো।'

'ও আচ্ছা।'

'তার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রক্ষা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে ছয় মাস ঘুমাত। তারপর একদিন জাগত। আবার ছ'মাসের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ত। এই জ্বনোই তার নাম কুস্তকর্ণ। আপনার বন্ধুকে যদি এইভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যেত আমি বেঁচে যেতাম।'

ভদ্রমহিলা কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। আবার বসে পড়লেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। দরজার দিকে তাকালেন। স্বামী এখনো ফিরছে না এটাই বোধ — হয় অস্থিরতার কারণ।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'ও এসে পড়বে। মিষ্টি গান আনতে গেছে। কাজের ছেলেটা গেছে ছুটিতে, বাধ্য হয়ে ওকেই পাঠাতে হয়েছে। এত দেরি কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোন রেইটরেটে টুকে পড়ছে কিনা কে জানে।'

'আমি কি আশপাশে খুঁজে আসব?'

'দরকার নেই। আপনি কোথায় খুঁজবেন। তারপর বলুন কেমন আছেন?'

'জ্বি ভাল আছি।'

'আরেক কাপ চা খাবেন?'

'জ্বি না।'

'ওর রোগটা কিভাবে হয় সেটা কি আপনি জানেন?'

'জ্বি না।'

'আমার সঙ্গে বিয়ের পরপর সে জার্মানী চলে যায় অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে। আমার জন্যে তখন তার খুব মন খারাপ থাকতো। কিছু

তাল লাগত না। শুধু যখন রেস্তুরেটে খেতে যেত তখন আমার কথা ভুলতে পারত। আমাকে ডোলার জন্যে খাওয়া ধরেছে। সেই খাওয়াই কাল হয়েছে।'

'ভালবাসার মনে ক্ষুধার যোগ আছে।'

'প্রেমিক-প্রেমিকাকে সব সময় দেখবেন কিছু না কিছু খাচ্ছে। এই চটপাট, এই আইসক্রীম, এই বাদাম, এই ফুচকা।'

'ও বলছিল আপনি নাকি তার চিকিৎসা করছেন। কি ধরনের চিকিৎসা বন্ধু তো?'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। ব্যাঙাটি আমাকে তার চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত করেছে কেন বুঝতে পারছি না। আমাকে সে এই প্রশ্নে কিছু বলেনি।

ভদ্রমহিলা পীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোন চিকিৎসায় ওর কিছু হবে না। চিকিৎসা কম করানো হয়নি। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো হয়েছে। ব্যাংকক নিয়ে পেট থেকে এক বালতি চর্বি বের করে ফেলা হয়েছে। অকুপাচার করানো হয়েছে। একবার একজন বলল যারা সারাক্ষণ খাই খাই করে গাজা খেলে তাদের ক্ষুধা কমে। আমি নিজে গাজা কিনে সিগারেটে ভরে তাকে খাইয়েছি। কিছু হয়নি। মানুষটা একদিন খেতে খেতে মারা যাবে। কি কুৎসিত ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন তো।

'ঠিক হয়ে যাবে।'

'কোনদিনও ঠিক হবে না। ওর যখন খুব ক্ষিধে পায় তখন ওর চোখের দিকে তাকাবেন। আপনার মনে হবে ও আপনার মতো করে খেয়ে ফেলার কথা মনে মনে ভাবছে। আপনি কি দু'টা মিনিট বসবেন, আমি একটা জরুরী টেলিফোন করে আসি।'

'আমি বসছি। আপনি টেলিফোন করে আসুন। কাজকর্ম সারুন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

আমি প্রায় এক ঘণ্টার মত বসে রইলাম। ভদ্রমহিলা এক সময় বললেন, ভাই, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি একটু খুঁজে দেখবেন? আশপাশের রেস্তুরেটগুলিতে গেলেই হবে। ও কোন একটা রেস্তুরেটে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে।

আশপাশের কোন রেস্তুরেটে ব্যাঙাটিকে পাওয়া গেল না। ব্যাঙাটি নেই— আমার পাঞ্জেরোও নেই। ডাইভার গাড়ি নিয়ে ভেগেছে।

আমি হেঁটে হেঁটে মেসে ফিরলাম। ব্যাঙাটিকে যে পাইনি সেই খবরটাও তার স্ত্রীকে দিয়ে এলাম না। বোচারীর বিব্রন্ন মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না।



তামান্না গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছে, হিমু ভাইয়া। হিমু ভাইয়া। এত আদর করে অনেক দিন কেউ আমাকে ডাকেনি। এটা যে বাস্তব কিছু না, স্বপ্ন দৃশ্য সন্দেহ সন্দেহে ফেললাম। গায়ে হাত দিয়ে তামান্না আমাকে ডাকবে না। এত আবেগ দিয়ে ভাইয়াও ডাকবে না; ভাইয়া সরাসরি উচ্চারণ করছে না— দু'টা চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করেছে। আবেগ মিশ্রিত চন্দ্রবিন্দু— হিমু ভাইয়া। হিমু ভাইয়া।

আমি এখন দু'টা জিনিস করতে পারি, ঘুম না ভাঙ্গিয়ে স্বপ্নটাকে লগা করতে পারি। কিংবা জেগে উঠতে পারি। ঘুমের মধ্যেই দোটারায় পড়ে গেলাম। তামান্না ডেকে যেতে লাগল, হিমু ভাইয়া। হিমু ভাইয়া। গায়ে ধাক্কার পরিমাণও বাড়তে লাগল। ঘুম ভাঙ্গল। বেলা অনেক হয়েছে, ঘরে রোদ ঢুকে গেছে। বিছানার কাছে মেসের ম্যানেজার সরফরাজ খাঁ দাঁড়িয়ে। চিকন গলায় তিনিই এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিলেন। তিনি ডাকছেন— হিমু ভাই। আমার মস্তিষ্ক ভাই ডাকটা বদলে ভাইয়া করে ফেলছে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ঘুম ভাঙ্গার পর পর মানুষ কিছু কান্ডকারখানা করে— আড়মোড়া ভাঙ্গে, হাই তোলে, চোখ ভলে এবং আবারো ঘুমের সুখ স্মৃতি কল্পনা করার জন্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও চোখ বন্ধ করে ফেলে। আমি তার কিছুই না করে মেস ম্যানেজারের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, 'আমাদের সোনার বাংলা শাশান হতে কত বাকি?'

মেস ম্যানেজার শ্রেণীর মানুষ যাদের প্রধান কাজ দিনে আট ন' ঘণ্টা কাঠের চেয়ারে বসে থাকা তারা সাধারণত খুব রাজনীতি সচেতন হন। সোনার দেশ কেন শাশান হচ্ছে এই নিয়ে তারা খুব ভাবিত থাকেন। সরফরাজ খাঁ সাহেব তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সোনার বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তার চেয়ে বেশি চিন্তা শেখ হাসিনা কিংবা বেগম জিয়া কেউ করেন বলে মনে হয় না।

এক দুপুরে ঘামে ভিজে ক্লান্ত হয়ে মেসে ফিরেছি। দেখি চোখ-মুখ শক্ত করে সরফরাজ খাঁ সাহেব কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। তাকে খুবই বিমর্ষ এবং

চিন্তিত মনে হচ্ছে। তিনি চোখের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'হিমু সাহেব, সোনার বাংলা যে শূশান হয়ে গেল সেটা জানেন?'

আমি বললাম, 'পুরোটা কি শূশান হয়ে গেছে না পাট বাই পাট হচ্ছে?'

'পুরোটা শূশান হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো হিশু ভাইদের জন্যে খুব সুবিধা হল। তারা যেখানে সেখানে মড়া পোড়াতে পারবে। মড়া নিয়ে এখন আর শূশান খুঁজতে হবে না। যে কোন জায়গায় মড়া চিং করে শুইয়ে হা করে মুখে আগুন দিয়ে দিলেই হল।'

সরফরাজ খাঁ আহত চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শান্তগলায় বললেন, 'ঠিক আছে হিমু সাহেব ঘরে যান। আপনার সঙ্গে কোন আলোচনায় যাওয়াটাই চুল।'

আমি ভেবেছিলাম সোনার বাংলা শূশান হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন শুনে আজও তিনি আহত চোখে তাকাবেন। তা করলেন না। মনে হয় আমার প্রশ্ন তার মাথায় ঢুকেনি। তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ভীত গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'পুলিশ এসেছে। আমিও পুলিশ।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আমাকে এয়ারেস্ট করতে এসেছে?'

'সে রকমই মনে হচ্ছে। পুলিশের একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে মেসের সামনে। পুলিশরা কেউ জীপ থেকে নামেনি। শুধু ওসি সাহেব নেমেছেন। ভয়ংকর রাগী চেহারা।'

'উনি কোথায়?'

'স্যারকে আমার ঘরে বসিয়েছি। চা দিয়েছি। নিমক পরা আনিয়েছি। এক প্যাকেট বেনসন আনিয়ে দিয়েছি।'

'চা-সিগারেট আছে?'

'এখন কথা বাড়াবেন না। পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নিচে চলুন। আপনাকে নিয়ে খুবই টেনশানে থাকি হিমু সাহেব। সাতটা বাজেনি এর মধ্যে পুলিশ এসে উপস্থিত। করেছেন কি আপনি?'

'মন্ত্রীর এক শালাবাবুকে মুখ ভেঙে দিয়েছিলাম। সেই মামলাটা ডিসমিস হয়ে গেছে জানতাম।'

সরফরাজ খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন, 'এত লোক থাকতে মন্ত্রীর শালাকে মুখ ভেঙে দিলেন কেন? বাংলাদেশে কি ভেঙে দেয়ার লোকের অভাব আছে? তের

কোটি মানুষ। পনেরো হাজার লোক বাদ দিয়ে বাকি বারো কোটি পঁচালি লাখ লোককে ভেঙে দিতে পারেন।'

রমনা ধানার ওসি সাহেব ম্যানেজারের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে বেনসনের প্যাকেট পড়ে আছে। প্যাকেট খোলা হয়নি। চায়ের কাপও চুমুক দেয়া। চায়ে সর পড়ে গেছে। ওসি সাহেব পুরনো অভ্যাস মত জিত দিয়ে ঠোঁট চাটছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। ঘৃণ পাওয়া যায় না এমন অঞ্চলে পোস্টিং হয়ে গেছে— নিঝুম দ্বীপ টিপের দিকে। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'স্যার কেমন আছেন?'

ওসি সাহেব আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সরফরাজ খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

সরফরাজ খাঁ দ্রুত ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। মনে হল দরজা ভেঙ্গে পড়ে যাবে। ওসি সাহেব মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই ইডিয়ট কে?'

আমি ওসি সাহেবের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'উনি এই মেসের ম্যানেজার সরফরাজ আলি খাঁ। খুব উচ্চ বংশ এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশ নিয়ে উনি সর্বক্ষণ চিন্তা ভাবনা করছেন। গবেষণা করছেন। সোনার বাংলা কেন শূশান হচ্ছে আপনি যদি উনাকে জিজ্ঞেস করেন উনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন।'

'বাজে পাঁচাল পারবেন না। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি— বলে চলে যাব।'

'কনু।'

'আপনাকে একটা রেপ কেসের কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'মনে আছে।'

'মিথ্যা আসামী দেয়ার কথা ছিল . . . ?'

'দিয়েছেন?'

'হুঁ না, আসল আসামী ধরেছি। ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছি।'

'আপনাকে এখনো নিঝুম দ্বীপে বদলি করিনি?'

'এত অল্প শাস্তি এরা আমাকে দেবে না। আমার জন্যে অনেক বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে।'

'ভয় পাচ্ছেন?'

'ভয় পাচ্ছি না।'

'আমার কাছে এসেছেন কি জন্যে খবরটা দেয়ার জন্য?'

'না। আমি এসেছি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। ঠিক করে বলুন তো আপনার কি কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে?'

'না।'

'আপনি নিশ্চিত যে আপনার কোন ক্ষমতা নেই?'

'মোটামুটি নিশ্চিত।'

'আমার ধারণা আছে। ঘটনাটা বলি— আমি মিথ্যা আসামীকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। সারারাত জেগে মামলা সাজিয়েছি। ঘুমতে গেছি ফজরের আজানের পরে। অনিয়ম করেছি তো, ঘুম আসছে না। কিমাছি। এপাশ-ওপাশ করছি। হঠাৎ তন্দ্রার মত এল। মনে মনে আপনাকে স্বপ্নে দেখলাম। আপনি আমাকে বললেন—ওসি সাহেব আপনাকে আমি এত স্নেহ করি আর এটা আপনি কি করলেন। নিরপরাধ কয়েকটা মানুষকে আপনি এমন এক কুৎসিত মামলায় জড়ালেন। আপনার জন্যে ভয়াবহ বিপদ কিছু অপেক্ষা করছে। দশ নম্বর মহা বিপদ সংকেত। এখনো সময় আছে। তখন ঘুমটা তেঙ্গে গেল। দেখি ঘামে শরীর ভিজছে গেছে।

ওসি সাহেব ঠাণ্ডা সর পড়া চায়ের কাপে নিজের ভুলে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন। আমি বললাম, ওসি সাহেব, আপনার মত জাঁদরেল লোক স্বপ্ন দেখে বিভ্রান্ত হন কি করে? এই স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যে ফ্রয়েড লাগে না। কুতুবুদ্দিন মিয়া টাইপ মানুষজনও ব্যাখ্যা দিতে পারবে। আমি আপনাকে বলেছিলাম মিথ্যা মামলায় না যেতে। ঐ জিনিসটা আপনার মাথায় থেকে গেছে বলেই স্বপ্ন।

'তা না।'

'তা না মানে?'

ওসি সাহেব আবার ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন আবারো মুখ বিকৃত করলেন। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বললেন, স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গার পর আপনি যে ব্যাখ্যাটা দিলেন সেই ব্যাখ্যাটা আমার মাথায়ও এল। আমি স্বপ্নটা মোটেই পাত্তা দিলাম না। হাত-মুখ ধুলাম। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে রীনাকে বললাম, রীনা চা দাও। রীনা হল আমার স্ত্রী। আমি বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছি রীনা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকল। টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এই শোন, আমি শেষ রাতে ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তুমি চোরাবালিতে আটকা পড়েছ। একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছ। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছ কেউ শুনছে না। তখন একটা ছেলে ছুটে এল। তার গায়ে হলুদ

রঙের পাঞ্জাবী। সে পাঞ্জাবী খুলে তোমার দিকে ধরেছে। তুমি পাঞ্জাবী ধরলে সে তোমাকে টেনে তুলবে। কিন্তু তুমি কিছুতেই পাঞ্জাবী ধরতে পারছ না। যতই ধরতে চেষ্টা করছ ততই চোরাবালিতে ডেবে যাচ্ছ।

বুখলেন হিমু সাহেব, রীনার কথা শুনে আমি সাত হাত পানির নিচে চলে গেলাম। কারণ আপনার কথা আমি আমার স্ত্রীকে কিছু বলিনি। স্বপ্নটা কি এখন আপনার কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে?

'না।'

'যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছে। আমার স্ত্রী শুধু শুধু কেন স্বপ্নে দেখবে আমি চোরাবালিতে পড়েছি।

'আপনি পুলিশ বিভাগে বিপজ্জনক চাকরি করেন। আপনার স্ত্রী আপনাকে নিয়ে দুর্গশঙ্কা করেন কাজেই এ ধরনের স্বপ্ন দেখা খুবই স্বাভাবিক। আপনি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে আপনাকে নিয়ে তিনি প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখেন।'

'আর হলুদ পাঞ্জাবীর ব্যাপারটা?'

'হলুদ পাঞ্জাবীর ব্যাপারটা ঠিক না। স্বপ্ন সব সময় শাদা-কালো হয়। স্বপ্নের আলো হল রাতের আলো। চাঁদের আলোয় রঙ দেখা যায় না বলে স্বপ্ন শাদা-কালো।'

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, হিমু সাহেব, এই কাগজটা আপনি রাখেন?'

'কি কাগজ?'

'এখানে আমার বাসার ঠিকানা লেখা আছে। আপনি চারটা ডাল-ভাত আমার এখানে খাবেন। আমি দেখতে চাই রীনা আপনাকে দেখে চিনতে পারে কিনা। স্বপ্নের হলুদ পাঞ্জাবী পরা মানুষ আর আপনি যে একই ব্যক্তি আমার ধারণা রীনা সেটা ধরে ফেলবে।'

'কবে আসতে বলছেন?'

'আজই আসুন। রাতে যান। আমি আপনাকে পাংশা মাছ খাওয়াব। পাংশা মাছ রীনা খুব ভাল রীধতে পারে।'

'পাংশা মাছ এর মধ্যে জোগাড় হবে?'

'তা হবে।'

'ওসি সাহেব আমি কি কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতে পারি? ভাল খাওয়া একা খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না, দলবল নিয়ে খেতে হয়।'

'ক' জন বন্ধু আসবে?'  
 'এই ধরুন চারজন। আমাকে নিয়ে পাঁচ। পাঁচ হল ম্যাজিক নাথার। এই জন্মেই পাঁচজন আসতে চাচ্ছি।'  
 'আসুন, পাঁচজনই আসুন। পাগাশ মাছ ছাড়া আর কি মাছ খেতে চান?'  
 'গলদা চিগড়ি?'  
 'আর কিছু?'  
 'বড় কাতল মাছের মাথা জোগাড় করতে পারবেন?'  
 'আর কিছু না।'  
 'রাত আটটার দিকে চলে আসবেন।'  
 ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কেমন যেন ইতস্তত করছেন। কিছু বলতে চান, বলতে পারছেন না এমন ভাব। আমি বললাম, 'স্যার কিছু বলবেন?'  
 'না, কিছু বলব না। আপনারা আটটার দিকে চলে আসবেন। দেরি করবেন না।'  
 'কিছু আচ্ছা। স্যার আপনি সিগারেটের প্যাকেট ফেলে যাচ্ছেন।'  
 ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ঢুকালেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরকত গিয়ে তিনিও অবিকল সরফরাজ আলি খাঁর মত কপালে ব্যথা পেলেন। সরফরাজ আলি খাঁ ব্যথা পেয়ে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছিল, ওসি সাহেব তা করলেন না। তিনি প্রচণ্ড শব্দে দরজায় লাথি মারলেন। দরজার উপরের কজ্জা সত্যি সত্যি খুলে গেল।  
 আমার চারজন বন্ধু নিয়ে ওসি সাহেবের বাসায় যাবার কথা। আমি ঠিক করে রেখেছি চারজন বন্ধু না, শুধু ব্যাঙাটিকে নিয়ে যাব। পাঁচজনের জন্যে রান্না করা থাকলে তার হয়ে যাবার কথা। তারপরও যদি শর্ট পরে রীনা ভাবী নিশ্চয়ই দশ বারোটা পরোটা চট চট ভেঙে দিয়ে দেবে।  
 মহিলারা ক্ষুধার্ত মানুষকে খাইয়ে আনন্দ পায় তবে সেই ক্ষুধার্ত মানুষকে হতনরিদ্র হলে চলবে না। ভিথরী বারান্দায় খেতে বসে এক পর্যায়ে যদি ক্ষীণ গলায় বলে, 'আমাজী ভাত শেষ, আর চাইরটা ভাত দেন তাহলে গৃহিণী বলবেন, আর ভাত নাই। তোমার জন্য লংগরখানা খোলা হয় নাই।'  
 জোবেদ সাহেবের দোকানে গেলাম টেলিফোন করতে। ব্যাঙাটিকে দাওয়াতের কথা বলতে হবে। ফাতেমা খালাকেও জানাতে হবে যে পাথর পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান চলছে। যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারে দুঃশিস্তা করে ফাতেমা খালা অসুখ বাঁধিয়ে ফেলেন। পাথর এখনো পাওয়া যায়নি এই চিন্তায় তার ডায়রিয়া হয়ে যাওয়া উচিত।

জোবেদ সাহেবের দোকান যথারীতি খালি। মাছিও উড়ছে না। তিনি আমাকে দেখে বিরস মুখে বললেন, 'হিমু সাহেব আপনার কাছে অনেক পাওনা হয়ে গেল। আমি হাসি মুখে বললাম, টাকা পেয়েছি। কুড়ি হাজার টাকা, এইবার আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব। টাকা আনতে তুলে পেছি।'  
 'আজকালের মধ্যে পেলে সুবিধা হত।'  
 'আজই পাবেন। রাতে আমার এক জায়গায় দাওয়াত আছে। যাওয়ার পথে দিয়ে যাব। টেলিফোনটা কি ঠিক আছে?'  
 জোবেদ সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছায় বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তার পাওনা মিটিয়ে দেব এই কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। কোন পাওনাদার যখন দিনক্ষণ উল্লেখ করে বলে এই দিনে টাকা দিয়ে দেব তখন অবধারিতভাবে জানতে হবে টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে না।'  
 'চা খাবেন হিমু সাহেব?'  
 'কি?'  
 'আপনাকে এই নিয়ে মোট কতকাপ চা খাইয়েছি জানেন?'  
 'কি না।'  
 'আজকেরটা নিয়ে নয়শ আঠারো কাপ।'  
 'আপনি আমাকে ক'কাপ চা খাওয়াচ্ছেন তারও হিসাব রাখছেন?'  
 জোবেদ সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দোকানদার মানুষ, হিসাব করা হচ্ছে আমার অভ্যাস। তাছাড়া ব্যবসাপাতি নাই, কাজ কর্ম নাই। ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ফলতু চায়ের কাপের হিসাব করতাম না।  
 নয়শ আঠারো নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি টেলিফোনে কথা বলছি। ব্যাঙাটিকে পাওয়া যায়নি, কথা বলছেন মহিলা ব্যাঙাটি।  
 'ভাবী আমাকে কি চিনতে পারছেন? আমি. . . ?'  
 'হ্যাঁ চিনতে পারছি। আপনি গতরাতে এসেছিলেন। আপনি চলে যাবার তিন-চার মিনিটের মাথায় ও এসেছে। এসে বেই শুনেছে আপনি ওর খোঁজ করতে বের হয়েছেন ওম্মি সে আবার বের হয়েছে। ফিরেছে রাত একটায়।'  
 'বলেন কি?'  
 'ভাল মানুষের মত ফেরেনি, মারধর খেয়ে ফিরেছে।'  
 'সেকি, মারধর কে করেছে?'  
 'হাইজ্যাকাররা ধরেছিল। টাকা পয়সা না পেয়ে চড় খাঙ্গর মেয়েছে। চরিওয়ালা মানুষ — মারলে আরাম লাগে। ওরা মনের সুখে মেয়েছে। তাও ভাল চড় খাঙ্গরের উপর দিয়ে গিয়েছে। পেটে ক্ষুর বসিয়ে দিলে পরাত। পরাত না?'

'অবশ্যই পারত। ভাবী, ওকি আশপাশে আছে?'

'হ্যাঁ আছে। যুমুচ্ছে। খুব ভয় পেয়েছিলাম। রাতে ঘুম হয়নি। সূর্য উঠার পর ঘুমতে গেছে। ওকে কি ডাকব?'

'না, ডাকার দরকার নেই। যুমুক। ওকে শুধু বলবেন রাত আটটার আগে খালি পেটে যেন আমার মেসে চলে আসে। ওর চিকিৎসা শুরু করেছি—প্রথম ডোজটা আজ পড়বে।'

'কি ধরনের চিকিৎসা করছেন?'

'জগামিচুড়ি টাইপ। টোটকা তত্ত্বময় মিলিয়ে একটা চিকিৎসা।'

'আপনার কি ধারণা কাজ হবে?'

'অবশ্যই কাজ হবে।'

'আমি তাকে অবশ্যই আটটার আগে পাঠিয়ে দেব।'

'বিকলে যেন নাশতা টাসতা কিছু না খায়। দুপুরে খেতে পারে কিন্তু সূর্য ডোবার পর কিছু মুখে দেয়া যাবে না।'

'আমি বলে দেখব। তাতে লাভ হবে কিনা জানি না। আমি চোখের আড়াল হলেই কিছু না কিছু খাবে। সোয়াবিন তেল যে খেতে পারে সে সবকিছুই খেতে পারে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন? মাঝে মাঝে মনে হয় — কেউ যদি আমাকে কেটে কুটে রাখত। ঝাল দিয়ে ভালমত কবিয়ে একটা বড় জামবাটিতে ওর সামনে দিয়ে বলত, এটা হল তোমার রান্না করা স্ত্রী। আপনার বন্ধু কিছু তারপরও খেয়ে ফেলত।'

'আমি হা হা করে হাসলাম। তবে আমার হাসি তেমন জমল না। শব্দটা ঠোঁটে হল। এবং ঠোঁটেই খুলে রইল। আমার মনে হচ্ছে মহিলার কথা ভুল না। ব্যাঙাটি ঠিকই জামবাটি শেষ করে নিচু গলায় বলবে, তরকারি কি আরো আছে? রান্নার পোশাক পাওয়া যাবে?'

নয়শ উনিশ নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ফাতেমা খালার সঙ্গে কথা হল। খালা এমিহেই উত্তেজিত থাকেন আজ তার উত্তেজনা সীমাহীন। ভালমত কথাই বলতে পারছেন না, কথা গলায় আটকে যাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলতে চাচ্ছেন পারছেন না। মানুষের মস্তিষ্ক এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা তৈরি করতে পারে কিন্তু মুখে বলতে পারে না। কথা বলার জন্যে দু'টা মুখ থাকলে ভাল হত বোধহয়। একটা মুখ থাকবে শুধু সত্যি কথা বলার জন্যে। আরেকটা মুখ সত্য-মিথ্যা সবই বলবে। আদালতে সাক্ষী দেবার জন্যে সত্যবাদী মুখ ব্যবহার করতে হবে। অন্যমুখ কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।

ফাতেমা খালা হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছেন। আমি রিসিভার কানে লাগিয়ে নয়শ উনিশ নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। চা ভাল হয়েছে। আজ মনে হয় নয়শ বিশ পূর্ণ করতে হবে।

'তোমার জন্যে একটা মারাখক খবর আছে রে হিমু। তুই বিশ্বাসও করতে পারবি না কত মারাখক। তামান্নাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ের কথা বললাম। সে রাজি হয়েছে। আমার আশংকা ছিল বোধহয় রাজি হবে না। তুই ষাঁড়ের গোবর হলেও তোর মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তামান্না বুদ্ধিমতী মেয়ে তো, সে ব্যাপারটা ধরেছে। তবে তামান্না যে বলতেই রাজি হয়ে যাবে ভাবিনি। আমি তামান্নার মা'র সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি বললেন, তামান্নার আসল মা তো আমি না, আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনি যদি পথ থেকে কোন কুঠরোগী ধরে নিয়ে এসে বলেন, এর সঙ্গে তামান্নার বিয়ে। আমি তখনও বলব, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।'

আমি খালার কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বললাম, 'কুঠ নিরাময় কেন্দ্র থেকে ইয়াং দেখে একটা কুঠ রোগী ধরে নিয়ে আসব?'

খালা ধমক দিলেন, 'অনেক ফাজলামী করেছিস আর না। শোন হিমু, তোদের বিয়ের সব শপিং আমি করব। বিয়ের শপিং করতে আমার সব সময় ভাল লাগে। ভাবছি কোলকাতায় চলে যাব। শাড়ি-গয়না কোলকাতা থেকে কেনাই ভাল। তবে দাদারা খুব ঠগবাজ। একবার যদি টের পেয়ে যায় আমি বাংলাদেশের সিদি, তাহলে সর্বনাশ। মোলায়েম করে চামড়া ছিলে ফেলবে। এত মোলায়েম করে চামড়া ছিলবে যে বোঝাই যাবে না চামড়া ছিলছে, বরং মনে হবে গা ম্যাসাজ করে দিচ্ছে।'

'কোলকাতা কবে যাচ্ছে?'

'সামনের সপ্তায় যাব। ইচ্ছা করলে তুই আমার সঙ্গে যেতে পারিস। তবে না যাওয়াই ভাল। বিয়ের শপিংএ হবু স্বামীর থাকতে নেই।'

'ঠিক আছে, তুমিই যাও।'

'বউকে কোথায় রাখবি, কি বাওয়াবি এইসব নিয়ে তুই একেবারেই ভাববি না। প্রথম এক বছর আমার সঙ্গে থাকবে। তিনটা ঘর তোকে আমি আলাদা করে দিয়ে দেব।'

'এসি দেয়া ঘর তো খালা?'

'ছাগলের মত কথা বলিস কেন? আমার কোন ঘর কি আছে এসি ছাড়া?'

'তাও তো ঠিক।'

'তোমার সঙ্গে বক বক করতে গিয়ে আসল কথাই ভুলে গেছি। পাথর কিনেছিলি?'

না।

খালা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'না মানে? কি বলছিস তুই?'

আমি করুণ গলায় বললাম, 'মেহকান্দার মিয়া পাথর নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

'স্বী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ মানে মহা সর্বনাশ। আমি হাল ছাড়িনি। ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছি।'

'গাড়ি লাগবে?'

'না, গাড়ি লাগবে না। পাছেরো জীপে করে ভিক্ষুক খোঁজা যায় না। তাছাড়া তোমার পাছেরো জীপের ড্রাইভার আমাকে পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করবে কিভাবে, তুই তাকে এক বাড়ির সামনে দাঁড়া করিয়ে উধাও হয়ে গেছি। বেচারার রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তোর জন্যে অপেক্ষা করেছে। এসব উদ্ভট কান্ডকরাখানা কেন করিস? এই বেচারাকে রাত তিনটা পর্যন্ত শুধু শুধু বসিয়ে রাখলি।'

'আর রাখব না। গাড়িটা তুমি পাঠিয়ে দিও।'

'একটু আগে না বললি গাড়ি লাগবে না।'

'এখন মনে হচ্ছে লাগবে। খালা গাড়িটা তুমি সারারাতের জন্যে দিও। ভিক্ষুকদের খোঁজ বের করার উত্তম সময় হচ্ছে রাত।'

'পাথরটা হাতছাড়া হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।'

'পাথর তুমি পাবে। একশ প্যারসেট গ্যারান্টি।'

'পাথরটার কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যায়।'

'অবশ্যই। তবে সামান্য কিছু আছে।'

'কিন্তু আবার কি?'

'মার্ফিন্স প' গল্পটা জান না খালা— ঐ যে একটা বাদলের খাবা ছিল, ঐ খাবাটার কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত। সমস্যা একটাই—ইচ্ছা পূর্ণ হবার পর পরই ভয়ংকর বিপদ হত।'

'বলিস কি? এত খাল কেটে কুমীর আনা।'

'পাথর প্রজেক্ট বাদ দিয়ে দিও।'

১১৬

ব্যাঙাচি চিন্তিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। যে অভিজি ডিনারের নিমন্ত্রণ এসেছে চা দিতে বললে সেই অভিজি একটু ভড়কে যাবেই। আমি বললাম, ওসি সাহেব আমাদের ডিনারের দাওয়াত করেছিলেন।

'জ্বি, আমি জানি। ও কোন বাজার করেনি। খুব জরুরী কি একটা কাজে আটকা পড়েছে। ও রেইটুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে আসবে। আপনারদের বসতে বসছে।'

'আমরা বসছি।'

'চা দেব?'

'দিতে পারেন।'

অনেকক্ষন অপেক্ষা করার পর কাজের একটি মেয়ে দু'কাপ চা এবং পিরিচে করে খানিকটা চানাচুর দিয়ে গেল।

ব্যাঙাচি ফিস্ফিস করে বলল, 'চানাচুর খাওয়া ঠিক হবে না। ক্ষিধে নষ্ট হবে।'

আমি বললাম, 'বেছে বেছে দু'একটা বাদাম খেতে পারিস।'

ব্যাঙাচি চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'বিকলে কিছু না খাওয়ার ক্ষিধেটা নাড়িতে চলে গেছে। যাই দেখছি তাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে।'

'সোফা চেয়ার ছাড়া তো এই ঘরে কিছু নেই। সোফা খাবি?'

ব্যাঙাচি কিছু বলল না। যেভাবে সোফার দিকে তাকাচ্ছে তাতে মনে হয় সোফা খাবার ব্যাপারটা সে বিবেচনায় রেখেছে। একেবারেই যে অগ্রাহ্য করছে তা না।

রাত এগারোটা বেজে গেল। ওসি সাহেবের স্ত্রী বড় বাটিতে করে এক বাটি পায়েস এবং পিরিচ চামচ দিয়ে গেলেন। আগের মতই ভীত গলায় বললেন, 'ও এতো দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না; কখনো এ রকম করে না। দয়া করে আর কিছুক্ষণ বসুন। আপনারদের নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে, পায়েস খান। ঘরে বানানো। কাগনের চাউলের পায়েস।'

আমি বললাম, 'আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমরা অপেক্ষা করব। আপনার মনে হয় শরীর ভাল না। আপনি বিশ্রাম করুন।'

'আমার শরীর আসলেই বেশ খারাপ। গায়ে জ্বর আছে। আপনারদের একা বসিয়ে রাখতে খুব খারাপ লাগছে— কিন্তু উপায় নেই।'

ব্যাঙাচি বলল, 'বাসায় টেলিফোন নেই?'

১১৮

'না না। আমার পাথর লাগবে। পাথর ছাড়া চলবে না। বিরাট ভুল করেছি— আসলে ঐ দিনই কিনে ফেলা উচিত ছিল।'

'ইয়াকুব প্রজেক্ট কি বাদ?'

'আচ্ছা আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? অর্থাৎ আগে কখনো দেখেছেন?'

ভদ্রমহিলা নিচু গলায় বললেন, জ্বি না।

'সঙ্গেও দেখেননি?'

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, 'ইয়াকুব তো পালিয়ে যাচ্ছে না। তুই পাথরটা আগে জোগাড় কর।'

'পাথর তোমার চাই-ই?'

'অবশ্যই চাই।'

'মনে হচ্ছে কিছু খরচাপাতি করতে হবে।'

'খরচাপাতি তো করবই। না করেছি? এখন কত লাগবে বল, ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দি।'

'এখন লাগবে না। প্রজেক্ট শেষ হোক। তারপর তোমার নামে বিল করব।'

রাত আটটার ওসি সাহেবের বাসায় যাবার কথা। আমরা আটটার আগেই উপস্থিত হলাম। ওসি সাহেবেরা খানার সঙ্গে লাগোয়া সরকারী বাসায় থাকেন বলে শুনেছি—এই বাড়িটা তা না। কলাবাগানে এ্যাপার্টমেন্ট হাউস। কলিংবেল টিপতেই রোগা একজন মহিলা দরজা খুললেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙেছে। ভয় এখনো কাটেনি। আমাদের দু'জনকে দেখে ভয় আরো যেন বাড়ল।

আমি বললাম, ওসি সাহেব কি বাসায় আছেন?

মহিলা শংকিত গলায় বললেন, জ্বি না। আপনার নাম কি হিমু?

'জ্বি।'

'জ্বি না, তবে ও আপনার কথা বলেছে। পাঁচজন আসার কথা না?'

'আমার বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। ও একাই চারজন—আর আমি এক পাঁচ।'

আমার রসিকতায় কাজ হল না। ভদ্রমহিলা ভীত গলায় বললেন, ওর আসতে একটু দেরি হবে। কি একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে। আপনারা বসুন। আমরা বললাম। ভদ্রমহিলা বললেন, চা দিতে বলি।

১১৭

'টেলিফোন আছে। দু'দিন ধরে ডায়ালটোন নেই। আমার এক ভাইকে খানায় খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি। আপনারা দয়া করে পায়েস খান।'

আমি পুরোবাটি পায়েস একাই খেয়ে ফেললাম। ব্যাঙাচি খেল না, সে ক্ষুধা নষ্ট করবে না। সে ফিস্ফিস করে একবার বলল, 'বারোটা পঁচিশ বাজে হোটেল তো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তুই হোটেল বন্ধ নিয়ে দুশ্চিন্তা করিস না। ওসি সাহেব কাচা কাজ করবেন না। তিনি খাবারের অর্ডার আগেই দিয়ে রেখেছেন।'

রাত একটার রীনা ভাবীর ভাই খানার খবর নিয়ে ফিরল। ওসি সাহেবের স্ট্রোকের মত হয়েছে। তাকে সোহরাওয়ার্দীতে নেয়া হয়েছে। অবস্থা ভাল না।

ওসি সাহেবের স্ত্রী চিংকার করে কাঁদছেন। আর ঘরে বসে থাকা যায় না। আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। ব্যাঙাচি ফিস্ফিস করে বলল, 'পায়েসটা না খাওয়া বিরাট বোকামী হয়েছে।'

১১৯





আজকাল মনে হয় চাইনীজ রেস্তুরেন্টগুলির ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে— খালি পায়ের আমাকে ঢুকতে দিতে আপত্তি করল না। রেস্তুরেন্টের বেয়ারা আমার নগ্নপদমুগলের দিকে তাকাল। খুব বিখিত হল বলেও মনে হল না। কিংবা কে জানে তার হয়ত বিখিত হবার ক্ষমতা চলে গেছে।

চাইনীজ রেস্তুরেন্টে ঢুকলেই অঙ্ককার কোণা খুঁজে বসতে ইচ্ছা করে। চট করে কেউ দেখতে পারবে না। আর দেখলেও চিনবে না। আপো থাকবে কম— কি খাচ্ছি তাও পরিষ্কার বোঝা যাবে না। ভাতের মাড়ের মত ঘন এক ঝুঁকু এনে দিয়ে বলবে সুপ। চামচ দিয়ে সেই সুপ মুখে তুলতে তুলতে বলতে হবে এই রেস্তুরেন্টের চেয়ে ঐ রেস্তুরেন্ট সুপটা ভাল বানায়। এই কথা থেকে অন্যরা ধারণা করে নেবে যে এই লোক নভিস কেউ না, চাইনীজ রেস্তুরেন্ট সে চবে বেড়ায়।

আমাদেরকে (আমাদের বলছি কারণ তামান্না আছে) ফাতেমা খালা আমাদের দু'জনকে চাইনীজ খেতে পাঠিয়েছেন। চাইনীজ খাবারের মাধ্যমে বিবাহ পূর্ব প্রেম গজাবে এই বোধহয় তার ধারণা। এক টেবিলের দু'দিকে দু'টা চেয়ার। সব চাইনীজ রেস্তুরেন্টে একটা অংশ থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যে।

তারা আসে দুপুর বেলা। অতি সামান্য খাবারের অর্ডার দিয়ে এসি ঘরে বসে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মেয়েটা সারাক্ষণ অভিমান করতে থাকে। ছেলের প্রধান কাজ হয় অভিমান ভাঙ্গানো। ছেলেটা হয়ত আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়েছে মেয়েটা মুখ অঙ্ককার করে বলবে, 'তুমি না বললে সিগারেট ছেড়ে দেবে?'

ছেলেটা বলবে, 'বলেছি নাকি?'

'কি বলেছ তাও ভুলে গেছ? আমার নাম মনে আছে তো। নাকি নামটাও ভুলে গেছ?'

'হঁ, কি যেন তোমার নাম?'

তোমাকে আমি এমন চিমটি দেব?'

'ও আচ্ছা, তোমার নাম মনে পড়েছে— তোমার নাম চিমটি রানী!'

'একি! তুমি আমাকে তুলিয়ে-ভালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছ? তোমার শরতানী বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হচ্ছি। ফেল বললাম সিগারেট।'

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ এসট্রেতে সিগারেট ফেলে দেবে। মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলবে, 'দেখি সিগারেটের প্যাকেট আমার কাছে দাও। দাও বললাম।'

সিগারেটের প্যাকেট দেয়া হবে। মেয়েটা সেই প্যাকেট তার ব্যাগে রাখতে রাখতে বলবে, 'এখন থেকে তোমার যদি সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে আমার কাছে চাইবে। আমি যদি দেই তবেই সিগারেট খাবে। না দিলে না।'

'ও-কে!'

'আচ্ছা যাও, আজ চাইনীজ যাওয়া উপলক্ষে তোমাকে একটা সিগারেট খাবার অনুমতি দেয়া হল। পুরোটা খেতে পারবে না। হাফ খাবে।'

'ও-কে!'

'একটু পর পর ও-কে ও-কে করছ কেন?'

ঘটা খানিক এই প্রসঙ্গ নিয়েই কথা চলবে। কথার অভাব কখনো হবে না।

তামান্নাকে নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসেছি। আরো কিছু জোড়া দেখা যাচ্ছে যারা সমানে কথা বলে যাচ্ছে। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তামান্না খুবই গভীর হয়ে আছে। তার বোধহয় খুব তাড়াও আছে। সে একটু পর পর ঘড়ি দেখছে। আমি অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য বললাম, 'তামান্না তুমি কি খাবে?'

তামান্না অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কি খাবে মানে? আমাকে তুমি করে বলছেন কেন?'

'দু'দিন পর বিয়ে হবে, এখন তুমি বলতে অসুবিধা কি? খালা বলছেন তুমি রজি।'

'আমি বিয়েতে রজি এমন কথা কখনো বলিনি। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি।'

'খালা তোমাকে বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না। তুমি তাকে অখুশীও করতে পারবে না। চাকরি চলে যাবে।'

'চাকরি চলে গেলে চলে যাবে। চাকরির জন্যে আমি যাকে তাকে বিয়ে করব?'

'সেটাও একটা কথা। বিয়ের মত একটা বড় ব্যাপার — সামান্য চাকরির জন্যে তোমায় বিয়ে করা ঠিক হবে না।'

'আশ্চর্য কাভ এখনো তুমি তুমি করছেন। আপনি কি জানেন আপনি খুবই নির্লজ্জ ধরনের মানুষ।'

'এত রেগে যাচ্ছে কেন? তোমার চেঁচামেচি শুনে সবাই আমাদের দিকে আগাচ্ছে— তারা ভাবছে আমরা বোধহয়, প্রেমিক-প্রেমিকা না। স্বামী-স্ত্রী। এমন চেঁচামেচি স্বামী-স্ত্রীরাই করে।'

'পীত অর কথা বলবেন না। খাবারের অর্ডার দিন। খেয়ে চলে যাই। সুপ অর্ডার দেবেন না। আমি খাই না।'

'টাকা এনেছেন তো?'

তামান্না বিখিত হয়ে বলল, 'আপনি কি সত্যি সত্যি টাকা আনেননি?'

না।

তামান্না গভীর গলায় বলল, 'আমার কাছে টাকা আছে। আপনি খাবারের অর্ডার দিন।'

'তুমিই দাও। তোমার কাছে কত টাকা আছে তা তো জানি না। টাকা বুঝে অর্ডার দিতে হবে। কাপড় হিসেব করে জামা বানাতে হবে। আছে হাফসার্টের মত কাপড়, তুমি বানিয়ে বসলে ফুল হাত সার্ট, ডাবল পকেট তা হবে না।'

তামান্না ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন আপনি অকারণে কথা বলছেন? আপনার নিজের ধারণা আপনি খুব মজা করে কথা বলছেন— আসলে তাও না। পুরানো সব কথা শুনে খুবই বিরক্তি লাগছে।'

'কথা বলব না?'

না।

'একেবারেই না? তুমি প্রশ্ন করলে উত্তর দেব না— কি তাও দেব না?'

তামান্না জবাব দিল না। সে বিরক্তির প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। ভয়াবহ ধরনের বিরক্ত মানুষ অদ্ভুত সব আচরণ করে। আমাদের ধারণা রাগে-দুঃখে মানুষ কীদে। বিরক্ত হয়েও হাউ মাউ করে কাঁদতে আমি দেখেছি। বিরক্তের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে তামান্না কি করে। আমার বাবা মহাপুরুষ বানানোর বিখ্যাত কারিগর তার উপদেশমালায় বলে গেছেন—

দুঃখী মানুষের কাছে থাকিও।

শোকগস্ত মানুষের কাছে থাকিও।

রাগে অন্ধ মানুষের কাছে থাকিও।

আনন্দিত মানুষের কাছে থাকিও।

দুঃখ-শোক, রাগ-আনন্দ তোমার ভিতরে আসিতে পারিবে না।

কিন্তু কদাচ বিরক্ত মানুষের কাছে থাকিও না।

বিরক্ত মানুষ ভয়ংকর।

১২২

তামান্না এখন প্রচণ্ড বিরক্ত কিন্তু তাকে মোটেই ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। বরং সুন্দর লাগছে। চশমা যেমন কাউকে কাউকে মানায় সবাইকে মানায় না, বিরক্তিও তেমন কাউকে কাউকে মানায়। তামান্নাকে খুব মানিয়েছে।

আমি খুবই নরম গলায় বললাম, 'তামান্না আমার জন্যে ছোট একটা কাজ করে দেবে?'

তামান্না কিছু বলল না। শুধু তার চোখ তীক্ষ্ণ করে ফেলল। আমি বললাম, 'তাকিয়ে দেখ জানালার কাছে যে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল বসেছে তাদের কাছ থেকে একটা সিগারেট এনে দেবে। তুমি চাইলেই দিয়ে দেবে।'

'ওদের কাছ থেকে সিগারেট এনে দিতে হবে?'

'আমিই চাইতাম। তবে আমি চাইলে নাও দিতে পারে। তোমার মত সুন্দরী কোন মেয়ে যদি সিগারেট তিফা চায় সে তিফা পাবেই।'

তামান্না তার ব্যাগ খুলে একশ টাকার একটা নোট বের করে বেয়ারাকে সিগারেট আনতে পাঠাল। এক প্যাকেট সিগারেট একটা দেয়াশলাই। আমি বললাম, 'থ্যাংকস।'

তামান্না বলল, 'থ্যাংকস ট্যাংকস কিছু দিতে হবে না। আপনি দয়া করে আর একটা কথাও বলবেন না।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

আমরা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম। খাওয়ার সময় তামান্না একবার জিজ্ঞেস করল, 'এদের রান্না তো ভালই, তাই না?' আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। খাওয়ার শেষে তামান্না জিজ্ঞেস করল, 'আইসক্রীম খাবেন?' আমি আবারো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

তামান্না বলল, 'ম্যাডামের পাথরটা কি পাওয়া গেছে?'

আমি না সূচক মাথা নাড়লাম। তামান্না বলল, 'প্রশ্ন করলে জবাব দিন। মাথা নাড়ানোড়ি অসহ্য লাগছে। ম্যাডামের পাথরটা জোপাড় হয়নি কেন?'

মেহকান্দর মিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথর নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোহিনুর হীরার আদি মালিককে যেমন এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে মেহকান্দরের অবস্থা সে রকম হয়েছে। সে তার কোহিনুর নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'আপনার ধারণা পাথরটা কোহিনুরের মতই দামি?'

'কোহিনুরের চেয়েও দামী। কোহিনুরের ইচ্ছাপূরণ ক্ষমতা ছিল না। এর আছে।'

'ক'টা ইচ্ছা এই পাথর পূরণ করে? একটা না তিনটা?'

১২৩

'সে ইচ্ছা পূরণ করতেই থাকে। এর ক্ষমতা এক এবং তিনে সীমাবদ্ধ নয়।'  
 'ভিক্ষুক মেছকান্দর মিমার ক'টি ইচ্ছা এই পাথর পূর্ণ করেছে?'  
 'মেছকান্দর মিয়া কখনো কিছু চায় না বলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ভিক্ষুকরা নিজের জন্যে কিছু চায় না। শুধুই অন্যের জন্যে চায়। ভিক্ষা করার সময় এরা কি বলে দয়া করে মন দিয়ে শুনবেন। এরা বলে, 'আম্মা আপনার ভাল করব বাবা। ধনে জনে বরকত দিব।' এরা কখনো বলে না, 'আম্মা তুমি আমার ভাল কর, আমাকে ধন জন দাও।'  
 'আপনাকে শুনিয়ে না বললেও আড়ালে যে বলে না, তো কি করে জানেন?'  
 'আড়ালেও বলে না। এরা ধরেই নিয়েছে এই জাতীয় চাওয়া মূল্যহীন। তাদের মত অভাজনের ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। কাজেই ইচ্ছা ব্যাপারটাই এদের জীবন থেকে চলে গেছে।'  
 'আপনি মনে হচ্ছে একজন ভিক্ষুক বিশেষজ্ঞ?'  
 'হ্যাঁ। প্রায়ই আমাকে যেহেতু ভিক্ষা করতে হয় ওদের সাইকলজি আমি জানি।'  
 'আপনাকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে হয়?'  
 'হ্যাঁ করতে হয়।'  
 'রাস্তায় কখনো হাত পেতে ভিক্ষা করেছেন?'  
 'করেছি। এক শবেবরাতের রাত্তি ভিক্ষা করে তিনশ একশ টাকা পেয়েছিলাম। খরচ-টরচ দিয়ে হাতে ক্যাশ ছিল দু'শ দশ টাকা।'  
 'খরচ-টরচ মানে কি? কিসের খরচ?'  
 'ভিক্ষার জন্যে জায়গাটা খুব ইম্পোর্টেন্ট। কোথায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করা হবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ভাল জায়গায় দখলের জন্যে টাকা খাওয়াতে হয়। জায়গা বুক করার জন্যে টাকা তো পাশেই— ভিক্ষা করে যে টাকা আয় হয় তার উপর কমিশনও দিতে হয়।'  
 'আপনি কি সব সময় বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন?'  
 'মাঝে মাঝে বলি। সব সময় বলি না।'  
 'আমার তো ধারণা আপনি সব সময়ই মিথ্যা কথা বলেন। আপনি একজন প্যাথলজিকেল লায়ার। এবং আমি নিশ্চিত আপনার কোন একটা মানসিক ব্যাধি হয়েছে। যে কারণে আপনি সত্যি কথা বলতেই পারেন না।'  
 'হতে পারে।'  
 'আপনি কি আমার একটা উপদেশ দয়া করে শুনবেন?'

'অবশ্যই শুনব।'  
 'আপনি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার চিকিৎসা দরকার।'  
 'আমি বললাম, 'আম্মা।'  
 'আপনি যে একজন মানসিক রোগী তা কি জানেন?'  
 'জানি।'  
 'তামান্না উঠে দাঁড়াতে পাড়াতে বলল, 'জানলেই ভাল। বেশিরভাগ মানসিক রোগীই জানে না যে তারা রোগী। সুস্থ মানুষের মত তারা ঘুরে বেড়ায়। খায়দায় ফুমায়।'  
 'আমি বললাম, 'তুমি কি আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে পারবে। ফাতেমা খালার পাথর তো পাওয়া গেল না—ভাবছি একটা ফলস পাথর কিনে নেব।'  
 'ফলস পাথর?'  
 'হ্যাঁ, দু'নখরী পাথর। বর্তমান যুগটাই হচ্ছে দু'নখরীর। কাজেই দু'নখরী পাথরই ভাল কাজ করবে।'  
 'তামান্না গভীর ভঙ্গিতে একশ টাকার একটা নোট বের করে দিল। আমি রিকশা নিয়ে রওনা হলাম। গাবতলী থেকে এই সাইজের একটা পাথর আনতে হবে। সিলেটের জাফলং থেকে নৌকা এবং বার্ল ভর্তি পাথর আসে গাবতলীতে। সেই সব পাথর ভেঙ্গে খোয়া বনানো হয়। সেই খোয়া বাড়িমর তৈরিতে ব্যবহার হয়। সুন্দর একটা পাথর গাবতলী থেকে জোগাড় করা কঠিন হবে না। পাথরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে, শিরীষ মারতে হবে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে একটা ওয়াশ দিতে পারলে ভাল হবে। দাগটাগ থাকলে উঠে যাবে।  
 'ওসি সাহেবকে দেখার জন্যে হাসপাতালে যাওয়া দরকার। হাসপাতালে তাঁর দিনকাল নিশ্চয়ই ভাল কাটছে না। ক্ষমতাবান মানুষদের জন্যে হাসপাতাল খুব খারাপ জায়গা। হাসপাতালের অপরিষ্কার বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে ক্ষমতাবান মানুষেরা এক সময় হঠাৎ বুঝতে পারেন— ক্ষমতা ব্যাপারটা আসলে ভূয়া। মানুষকে কখনোই কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি।'



‘এইটাই সেই পাথর?’

ফাতেমা খালা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন? এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে নাদির শাহ কোহিমুর পাথরের দিকে তাকিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। তেতুলের আচার দেখলে কিশোরীর মুখভর্তি লালা এসে যায়। খালার মুখেও লালা জমছে।

‘পাথরটার ওজন কত রে?’

‘চল্লিশ হাজার ক্যারেটের মত।’

‘কত কেজি বল? ক্যারেটে বলছিস কেন?’

‘দামী জিনিস তো খালা— এই জন্যেই ক্যারেটে হিসেব হচ্ছে।’

‘পাথর জোপাড় করতে খরচ কত পড়ল?’

‘খরচ ভালই পড়েছে তবে তুমি এই মুহুর্তে খরচ নিয়ে চিন্তা করবে না।

আগে নিশ্চিত হয়ে নাও যে পাথরটা কাজ করে। যদি দেখা যায় এটা ফালতু রক্তার পাথর তাহলে শুধু শুধু এর পেছনে এত টাকা খরচ করব কেন?’

‘পাথর ফেন্ত নেবে?’

‘অবশ্যই ফেরত নেবে। তুমি আগে ব্যবহার করে দেখ জিনিসটা কেমন?’

‘ব্যবহারের নিয়ম কি?’

‘নিয়ম জটিল না। গোদুগীলগ্নে পাক-পবিত্র হয়ে পদ্মাসনে বসতে হয়। পাথরটা রাখতে হয় কোলে। বসতে হয় উত্তরমুখী হয়ে। পাথরটার উপর প্রথম ডান হাত রাখতে হয়। ডান হাতের উপর থাকবে বাঁ হাত। আঙ্গুলগুলি থাকবে ৯০ ডিগ্রী এক্সেলে। মিনিট দশকে চূপচাপ বসে থেকে বা চাইবার তা চাইতে হয়। ও আসল কথা বলতে তুলে গেছি। পাথরটা কোলে বসাবার আগে পরিষ্কার পানিতে তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। মনের ইচ্ছা বলার পর পাথরটা বড় এক বলতি পানিতে ডুবিয়ে রাখবে। ইচ্ছাপূর্ণ হবার পর পাথরটা পানি থেকে তুলতে হবে। যে পানিতে পাথর ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল সেই পানি কিছু নষ্ট করা যাবে না বা ফেলে দেয়া যাবে না।’

‘এক বলতি পানি কি করব?’

‘পানিটা ফুটিয়ে বাষ্প করে বাতাসে মিলিয়ে দিতে হবে।’

‘জটিল কিছু না। আমার তো মনে হচ্ছে অত্যন্ত জটিল। তুই কাপজে লিখে দে তো। ভাল কথা— যে বলতিতে পাথরটা রাখব সেই বলতি কিসের হবে? প্রান্তিকের বলতিতে চলবে?’

‘প্রান্তিকের বলতিতে চলবে, সবচে ভাল হয় রুপার বলতিতে রাখলে। অমৃত বেমন মাটির হাড়িতে রাখা যায় না, স্বর্ণ ভাঙে রাখতে হয় সে রকম আর কি?’

‘রুপার বলতি কিনব?’

‘বাদ দাও। পাথর কাজ করে কি করে না— আগেই রুপার বলতি।’

খালা বললেন, রুপার বলতিতে আর কত খরচ পড়বে? তুই ম্যানেজারকে নিয়ে যা তে— রেভিমেন্ট রুপার বলতি পাবি বলে তো মনে হয় না। একটা অর্ডার দিয়ে আয়। থাকুক একটা রুপার বলতি।

ম্যানেজার বুলবুল সাহেবকে খুব বিষণ্ণ লাগছে। আজ তিনি চকচকে লাল রঙের টাই পরেছেন। লাল টাইও তাঁর বিষন্নতা দূর করতে পারছে না। বরং আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ম্যানেজার সাহেব বললেন, ‘আপনার ভাগ্যটা ভাল।’

আমি হাসলাম। ভাগ্য বে ভাল তা স্বীকার করে নিলাম।

ম্যানেজার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আপনাকে আমি ঈর্ষা করি।’

আমি বললাম, ‘আমি নিজেও নিজেকে ঈর্ষা করি।’

‘ইদানীং আমার প্রায়ই ইচ্ছা করে স্যুট-টাই ফেলে দিয়ে আপনার মত বের হয়ে পড়ি। তবে খালি পায়ে না। ঢাকার পথে খালি পায়ে হাঁটা খুবই আন-হাইজিনিক।’

‘ঠিক বলেছেন।’

‘হিমু সাহেব আপনাকে তো কনগ্রাচুলেশন জানানো হয়নি — কনগ্রাচুলেশন।’

‘কি জন্যে পাথর খুঁজে পেয়েছি এই জন্যে?’

‘তামান্নার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে এই জন্যে। অত্যন্ত ভাল মেয়ে। রূপ আর গুণ তেল জলের মত। হাজার ঋীকালেও মিশে না। তামান্নার ক্ষেত্রে এই মিশ্রণটা ঘটেছে। আপনি অসম্ভব ভাগ্যবান একজন মানুষ।’

‘ধন্যবাদ। তামান্নাকে কি আপনার খুব পছন্দ।’

'উনার মধ্যে পছন্দ না হবার কিছু নেই। এক সঙ্গে কাজ করি তো। কাছ থেকে দেখেছি।'

'বিয়ে এখনো ফাইনাল হয়নি। কথাবার্তা হচ্ছে।'

'আমি যতদূর জানি সব ফাইনাল হয়েছে। তারিখ পর্যন্ত হয়েছে। ম্যাডাম আপনাকে সারগ্রাহী দেয়ার জন্যে কিছু বলছেন না। একদিন বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আপনাকে সারগ্রাহী দেবেন। ম্যাডামের মধ্যে এইসব ছেলেমানুষী আছে।'

'কার্ডের টাকাটা জলে যাবে। তামান্না শেষ পর্যন্ত রাজি হবে না।'

'একটা খবর আপনি জানেন না, আমি জানি — তামান্না আপনাকে খুবই পছন্দ করেন। পাগলশ্রেণীর মানুষদের জন্যে মেয়েদের বিশেষ কিছু মমতা থাকে। আপনাকে পাগলশ্রেণীর বলায় আশা করি কিছু মনে করছেন না।'

'জ্বি না, মনে করছি না।'

আমি রূপার বালাড়ির অর্ডার দিলাম। ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'চলুন আপনাকে কিছু কাপড়-চোপড় কিনে দেই। আপনাকে প্রেক্ষেপ্টেবল করার দায়িত্ব ম্যাডাম আমাকে দিয়েছেন।'

আমি বললাম, 'চলুন।'

'সুট কখনো পরেছেন?'

'জ্বি-না।'

'চলুন একটা সুট বানিয়ে দেই।'

'চলুন।'

ম্যানেজার সাহেব কিছুক্ষণ চূপচাপ থেকে হঠাৎ বললেন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি হিমু সাহেব, দয়া করে সত্যি জবাব দেবেন।'

'অবশ্যই সত্যি জবাব দেব।'

'যে পাথরটা আপনি ম্যাডামকে দিয়েছেন — সত্যি কি তার ইচ্ছা পূরণ ক্ষমতা আছে?'

'এখনো জানি না। আপনি টেস্ট করে দেখুন না। পাথর তো আপনার হেফাজতেই থাকবে।'

'একটা সিগারেট দিন তো হিমু সাহেব, সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে।'

'সিগারেট সঙ্গে নেই। কিনতে হবে। পাঞ্জাবীর পকেট নেই তো — সিগারেট কোথায় রাখব ভেবে কেনা হয় না।'

'আসুন আজ আপনাকে গোটা তিনেক পকেটওয়ালা পাঞ্জাবীও কিনে দেই। অসুবিধা আছে?'

'জ্বি না, অসুবিধা নেই।'



সুন্দরী মেয়েদের হাতের লেখা সুন্দর হয়। এটা হল নিপাতনে সিদ্ধ। সুন্দরীরা মনে প্রাণে জানে তারা সুন্দর। তাদের চেঁচাই থাকে তাদের ঘিরে যা থাকবে সবই সুন্দর হবে।

আমি তামান্নার চিঠি হাতে নিয়ে প্রথমেই হাতের লেখার তারিফ করলাম। সুন্দর হাতের লেখার একটা সমস্যা হচ্ছে — তুল বানান খুব চেখে পড়ে। তামান্নার চিঠি পড়ছি বানান তুল এখনো চোখে পড়ছে না — মেজাজ খারাপ হচ্ছে। দীর্ঘ একটা চিঠিতে সে বানান তুল কেন করবে না। সে কি চলন্তিকা সামনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেছে। চিঠি পড়ে তাও তো মনে হচ্ছে না। ডিকশনারী সামনে নিয়ে লেখা চিঠি ভারি ধরনের হয়, এই চিঠি ভারি স্কী না। বরং মজার ভঙ্গিতে লেখা।

হিমু সাহেব,

আপনাকে একটা মজার খবর দেয়ার জন্যে চিঠি লিখতে বসেছি।

আপনাকে তো টেলিফোনে পাওয়া সম্ভব না। কাজেই অফিস পিওনকে বলে দিয়েছি সে যেন সূর্য উঠার আগে আপনার মেসে উপস্থিত হয়। আমাদের এই পিওন বোকা টাইপের। তাকে যা বলা হয় রোবটের মত তাই সে করে। কাজেই আমার ধারণা তোর পঁচটায় ঘুম ভাঙিয়ে সে আপনাকে আমার চিঠি দিয়েছে।

মজার খবরটা এখন দিচ্ছি। ম্যাডামের বহুমূল ধারণা হয়েছে যে, আপনার পাথরটা কাজ করছে। তিনি পাথরের কাছে প্রথম যে জিনিসটা চেয়েছেন তা হল — রাতের ঘুম। পাথর তার ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। গত চার রাত ধরে ম্যাডাম কোন রকম ঘুমের অশুখ ছাড়াই ঘুমুচ্ছেন। রাত এগারোটার দিকে ঘুমুতে যান — ভোর ন'টার আগে ওঠেন না। ম্যাডাম পাথরের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত। আমি আপনার মানুষকে বিস্মিত করার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত।

ম্যাডাম যে হারে লোকজনের কাছে পাথরের গন্ধ করছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকা অফিস থেকে লোকজন এসে পাথরের ছবি তুলে নিয়ে যাবে। টেলিভিশনের কোন ম্যাপাজিন অনুষ্ঠানেও ম্যাডামকে পাথরসহ দেখা যাবে।

হিমু সাহেব, বলুন তো আপনি এই পাথর দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন? কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া আপনি কিছু করেন না। সেই উদ্দেশ্যটা আমি আসলে ধরতে পারছি না।

যাই হোক, এখন আমি আমার বিয়ের প্রসঙ্গে আসি। আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে খবর পেয়ে গেছেন যে বিয়ের তারিখ হয়েছে মার্চের ১৫ তারিখ শুক্রবার। দাওয়াতের কার্ড ছাপা হয়েছে। বিয়ের নানান কর্মকাণ্ড নিয়ে ম্যাডামের সিমাহীন ব্যস্ততা। আমার হাত-পা কাঁপছে। ম্যাডাম এত আনন্দ নিয়ে ছুটছুটি করছেন—আমি কি করে ডাকে বলব যে আমার পক্ষে আপনাকে বিয়ে করা কিছুতেই সম্ভব না।

একমাত্র আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আপনি কি দয়া করে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবেন? তাহলে আমি আমার মত চাকরি করে যেতে পারি। সব ঠিকঠাক মত চলতে থাকে। বিয়ে ভাঙ্গার কারণে ম্যাডাম যদি আপনার উপর রাগ করে তাহলে আপনার কিছুই হবে আসবে না। কিন্তু আমার হবে আসবে। আমার পক্ষে চাকরি ছেড়ে দেয়া কিছুতেই সম্ভব না। আপনি আমার জন্যে কিছু না করলে আমাকে নিতান্তই বাধা হয়ে আপনাকে বিয়ে করতে হবে। তার ফল আপনার বা আমার কারো জন্যেই স্তব্ধ হবে না।

আমি আপনার কাছে হাত জোড় করছি, আপনি আমাকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

বিনীতা  
তামান্না।

চিঠি শেষ করে খুশি খুশি লাগছে। এক ভুল বানান পাওয়া গেছে সীমাহীনের সী লিখেছে হস্যইকার দিয়ে। অবশ্য দীর্ঘই নাও হতে পারে। আধুনিককালের বানান তো সব পাক্টে যাচ্ছে। শাড়ী বাড়ী এখন লেখা হচ্ছে হস্যইকার দিয়ে। সূর্য লেখার সময় আগে রেফের পরে য-ফলা লাগত। এখন লাগে না—সূর্যের তেজ কম গেছে। তার জন্যে বাড়তি য-ফলা এখন দরকার নেই।



ফাতেমা খালার বসার ঘরের এক কোণায় খালার ম্যানেজার বসে আছেন। ম্যানেজার মুখ গভীর। চোখ বিষণ্ণ। বসার ভঙ্গিও বিষণ্ণ। হালকা সবুজ স্যুট এবং চকচকে লাল টাই এ বিষণ্ণতা দূর করছে না। ফাইজার অম্বু কোম্পানি এখন তাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করতে পারে। তাঁর একটা ছবি। ছবির নিচে ক্যাপশন—

বিষণ্ণতা একটি ব্যাধি।

ম্যানেজার আমার দিকে তাকালেন—অপরিচিত মানুষের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকানো হয় অবিকল সেই দৃষ্টি। আমি হাসিমুখে বললাম, 'ম্যানেজার সাহেব, আপনার কি বিষণ্ণতা ব্যাধি হয়েছে?' ম্যানেজার চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তামান্না ম্যাডামের সঙ্গে আছে।'

ভ্রমলোক আমি কি বলেছি না শুনেই জ্বাব দিয়েছেন। লক্ষণ মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। আমি বললাম, 'আপনি ভাল আছেন?'

ছিঁ!

'কোন কারণে কি মন খারাপ?'

'ছিঁ না, মন ভাল। তামান্না ম্যাডামের সঙ্গে আছেন।'

'তামান্নার কথা কিছু জানতে চাইনি। আপনার কি হয়েছে বলুন তো?'

'শরীর ভাল যাচ্ছে না। ঘুমের সামান্য সমস্যা হচ্ছে।'

'ইচ্ছাপূরণ পাথরে হাত দিয়ে ঘুম চাইলেই হয়। ঘুমের অম্বু তো আপনার হাতের কাছে। হাত বাড়ালেই পাথর।'

ম্যানেজার সাহেব বসে পড়েছেন। এখন তার দৃষ্টি ঘরের কার্পেটে। কার্পেটের নকশার নৌশর্যে তার বিষণ্ণতা আরো বাড়ছে। আমি খালার সন্ধানে ভেতরে ঢুকে গেলাম। এ বাড়িতে এখন আমার অবাধ গতি—যে কোন ঘরে ঢুকে যেতে পারি। কাকের মেয়েগুলি চাপা রাগ নিয়ে তাকায় কিন্তু কিছু বলে না।

খালাকে তার শোবার ঘরে পাওয়া গেল। তিনি পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। একটা কাঞ্জের মেয়ে তার চুলের গোড়ায় তেল ডলে ডলে দিচ্ছে। প্রকিয়া যথেষ্টই জটিল। এক গোছা চুল আলাদা করে তুলে ধরা হয়। চুলের গোড়া ম্যাসাজ করা হয়। তেল দেয়া হয়। সেই চুলের গোছা ধরে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে কিছুক্ষণ টানাটানি করা হয়।

খালা ইশারায় খাটের উপর আমাকে বসতে বললেন। এবং ইশারাতেই কাঞ্জের মেয়েটিকে চলে যেতে বললেন। অতিরিক্ত ধনবানোরা ইশারা বিশারদ হয়ে যায়। এমনিতে সারাক্ষণ কথা কিছু আদেশ জারির ক্ষেত্রে চোখের বা হাতের ইশারা।

'মাথার চুল সব পড়ে যাচ্ছে রে হিমু! খুব দুশ্চিন্তায় আছি।'

'দুশ্চিন্তার কি আছে? পাথরের কাছে চুল চাও।'

'সামান্য জিনিস চাইতে ইচ্ছা করে না। বড় কিছু হোক তখন চাইব। পাথর তো ঘরেই আছে। পালিয়ে যাচ্ছে না তো।'

'পাথর তোমার মনে ধরেছে?'

খালা সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'পাথর নিয়ে শুরুতে তোর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। ব্যবহার করে আমি হতভম্ব।'

'কোন সাইড এফেক্ট নেই তো?'

'সাইড এফেক্ট আছে তবে পজ্জিটিভ সাইড এফেক্ট। আমার তো রাতে ঘুম হত না। পাথরটার কাছে ঘুম চাইলাম। এখন কোন অশুধ ছাড়া মড়ার মত ঘুমুছি। রাত দশটার সময় বিছানায় যাই। পুরানো অভ্যাসমত ভেড়া গুণতে শুরু করি। বললে বিশ্বাস করবি না চল্লিশটা ভেড়া গোনার আগেই ঘুম।'

'সাইড এফেক্ট কি?'

'বললাম না পজ্জিটিভ সাইড এফেক্ট। যেসব জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা হত সে সব নিয়ে এখন আর দুশ্চিন্তা হয় না। ঐ যে ইয়াকুবকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতাম— তোর খালু কেন ঐ হারামজাদাটাকে এত টাকা দিয়ে গেল। এখন আর দুশ্চিন্তা হয় না। দিয়েছে ভাল করেছে।'

'ইয়াকুবের সঙ্গে কথা বলব না?'

'কোন দরকার নেই।'

'তোমার জীবন তো খালা টেনশান ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, তুমি বাচবে কি করে? এখন তো তুমি হট করে মরে যাবে।'

'খামাখা কথা বলিসনা তো হিমু।'

'বেঁচে থাকার জন্যে টেনশান লাগে খালা। যার যত টেনশান তাঁর বাঁচা তত আনন্দময়।'

'আমার টেনশান যথেষ্টই আছে। আমার টেনশান নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বুলবুল বলছে চাকরি করবে না। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। বুলবুলের মত আরেকজন মাসে লাখ টাকা দিলেও পাব না।'

'বুলবুল সাহেব চাকরি করবেন না কেন?'

'জানি না কেন, পরিষ্কার করে কিছুই বলছে না। সারাক্ষণ মুখ ভোঁতা করে থাকে।'

'পাথরকে বল বুলবুল যেন তোমাকে ছেড়ে না যায়।'

'তাই মনে হয় বলতে হবে। হিমু তুই পাথরটার খরচ নিয়ে যা। কত খরচ পড়ল?'

'পাথর উদ্ধারের ব্যাপারে একজনের সাহায্য নিয়েছি। বলতে গেলে সেই পাথর এনে দিয়েছে। তার নাম ছকু। ছকুর খুব শখ একটা স্টেশনারীর দোকান দেবে।'

'এ তো মেশা টাকার ব্যাপার।'

'পাথরটা কি তুমি দেখবে না?'

'আচ্ছা যা দোকান দিয়ে দেব। বুলবুলকে এখন বলে দিচ্ছি সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে।'

'আমি ছকুকে নিয়ে আসি?'

'যা নিয়ে আয়। আর দাওয়াতের কার্ডগুলি নিয়ে যা। তুই তোর বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত করবি না?'

'কার্ড সুন্দর হয়েছে খালা।'

'সুন্দর হবে না? কি বলিস তুই? কার্ড আমি নিজে বেছে কিনেছি।'

'তামান্না কি আশপাশে আছে?'

'হ্যাঁ আছে। এখন ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাবি না। বিয়ের আগে কনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক না।'

'আমি শুধু একটা কথা বলে চলে যাব।'

'কি বলবি?'

'সেটা তো খালা তোমাকে বলা যাবে না।'

কৌতূহলে খালার চোখ চকচক করছে। কি কথাটা বলা হবে তা জানার জন্যে তার মধ্যে টেনশান তৈরি হচ্ছে। টেনশান তৈরি হচ্ছে বলেই তিনি বেঁচে আনন্দ পাচ্ছেন।

খালার হাত থেকে দাওয়াতের কার্ড নিলাম। প্রথম কার্ডটা দিলাম তামান্নাকে। আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ আমি আমার হুঁ স্ত্রীকে করব না? সেটাই তো স্বাভাবিক।

তামান্না গভীর গলায় বলল, 'থ্যাংকস।'  
আমি বললাম, 'তুমি কেমন আছ তামান্না?'  
তামান্না বলল, 'ভাল।'  
'তোমার ঘুম হচ্ছে তো?'

তামান্না কিছু বলল না। তার সাথে রাগ নেই, দুঃখবোধ নেই, অভিমান নেই। যেন সে পাথরের একটা মেয়ে। আমি দাওয়াতের কার্ড নিয়ে রক্তা হলাম। কার্ডগুলি বিলি করতে হবে। কার্ড কানের দেব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—

ভিক্টর মেহকান্দার

ছক্কু

দেশ প্রেমিক জোবেদ আলি  
ওসি রমনা থানা  
ইয়াকুব সাহেব।

আম্মা রূপাকে একটা কার্ড দেব না? অবশ্যই দেব। সবার শেষে দেব। রূপাকে কার্ড দেবার পর যে কার্ডগুলি বাঁচবে সেগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'হিমু সাহেব না?'

'ঠিকই চিনেছেন। আমি আপনাকে চিনতে পারছিলাম না। আপনার একি অবস্থা?'

'মরতে বসেছি হিমু সাহেব।'

'ভাই ভো দেখছি।'

ওসি রমনা থানা উঠে বসতে গিয়েও বসলেন না। আবার শুয়ে পড়লেন। বড় বড় করে শ্বাস নিতে লাগলেন। এই কয়েকদিনেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। চোখে মুখে ঘুম ঘুম ভাব। ডাক্তাররা সম্ভবত ঘুমের অম্লের মতোই তাকে রাখছে। চোখ কেটে গেলে চুকে গেছে।

ভদ্রলোক কেবিনে সীট পাননি। তার দু'পাশেই রোগীর সমুদ্র। এদের মধ্যে একজন বোধহয় মারা যাচ্ছে। ডাক্তার নার্স তাকে নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট করছে। আমি ওসি সাহেবের পাশে বসতে বসতে বললাম, 'আপনার হয়েছেটা কি বলুন দেখি।'

'স্ট্রোক করেছে। বা পাটা কোমরের নিচ থেকে অচল।'

'বলেন কি?'

'পুরো ভেজিটেবল হয়ে গেছি। নিজেই মনে হচ্ছে চালকুমড়া।'

ওসি সাহেব আবারো উঠে বসতে গেলেন। আমি তাকে সাহায্য করলাম। পিঠের নিচে বাগিশ দিয়ে দিলাম। ওসি সাহেব রক্ত গলায় বললেন, 'একটা মশা আমাকে খুব বিরক্ত করছে। মেরে দিন তো।'

আমি মশা মেরে দিলাম। ওসি সাহেব মৃত মশার দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কোন মৃত মশার দিকে এত কৌতূহল নিয়ে রোমাণ রসও তাকাননি। ওসি সাহেব মশার দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন, 'হিমু সাহেব! যেন আমি না, মশাটাই হিমু!'

আমি বললাম, 'জ্বি।'

'আপনি এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনি কি একটা ব্যাপার জানেন? আমি যে মরতে বসেছি আপনার জন্যেই মরতে বসেছি।'

আমি বললাম, 'জানি। আমার কথা শোনার জন্যে আপনার উপর প্রেসার তৈরি হল। সেই প্রেসারের স্ট্রোক। আপনার চাকরি আছে না, গেছে?'

'সাসপেনসনে আছি। চাকরি শেষ পর্যন্ত থাকবে বলে মনে হয় না।'

'অপরোধী যাদের ধরেছিলেন তারা কি ছাড়া পেয়েছে?'

'জ্বি না। তারা ছাড়া পায় নাই। তদন্তের ফলাফল এমন যে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া অসুস্থ ধরা পড়েছে।'

অনেকক্ষণ পর ওসি সাহেবের মুখে আনন্দের হাসি দেখা গেল।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমি তো মরতে বসেছি কিন্তু আছি সুখে। অনেকদিন পর প্রথম বুঝলাম যে আমি মানুষ। এত ভাল লাগল। চাকরি চলে গেলে চলে যাবে— ভিক্ষা করব।'

'পা নষ্ট ভিক্ষা করার জন্যে যোড়া কিনতে হবে। যোড়ায় চড়ে ভিক্ষা।'

ওসি সাহেব শব্দ করে হেসেই হাসি গিলে ফেললেন। হাটের রোগীদের জেনারেল ওয়ার্ড শব্দ করে হাসির জায়গা না। অন্য রোগীরা অবাক হয়ে আমাদের দেখছে।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'খুব ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিল। মায়ের চেহারা-টেহারা কিছুই মনে নেই। গতকাল রাতেই মাকে স্বপ্নে দেখলাম। মা বললেন, যোকন, তোর উপর আমি খুশি হয়েছি। তোর পা ঠিক হয়ে যাবে, পা নিয়ে দৃষ্টিস্তা করিস না।'



'নানান ধরনের অপরাধ আপনি করতেন। অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার এই স্বপ্ন দেখছেন।'  
 'আপনার যা ইচ্ছা আপনি বলতে পারেন। ঘটনা যে কি তা আমি জানি।'  
 'ভাবী কোথায়?'  
 'ও বেবী একপেট করছে তো। এডভান্সড স্টেজ। প্রতিদিন আসতে পারে না। গতকাল এসেছিল আজ আসবে না।'  
 'ভাবী বেবী একপেট করছেন না-কি? উনাকে দেখে কিছু বোঝা যায়নি।'  
 'খুব সবধানে নিজেই আঁড়াল করে রাখে বলে কিছু বোঝা যায় না।'  
 'এটাই কি উনার প্রথম সন্তান?'  
 'এর আগে তিনটা সন্তান হয়েছে। তিনটা সন্তানই মৃত অবস্থায় হয়েছে। তবে এবারেরটা বাঁচবে। কি হিমু সাহেব, আপনি বলেন দেখি বাঁচবে না?'  
 'হ্যাঁ বাঁচবে।'  
 'আমি ঠিক করে রেখেছি হলে হলে নাম রাখব হিমু।'  
 'আপনার মেয়ে হবে।'  
 'মেয়ে হলে তার নাম হিমি।'  
 'ওসি সাহেব আবাবারো শব্দ করে হাসলেন। এবার আর হাসি গিলে ফেললেন না। অন্যান্য বেতের রোগীরা উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। কেউ রাগ করছে না। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, 'ওসি সাহেব কার্ডটা রাখুন।'  
 'ওসি সাহেব বিম্বিত হয়ে বললেন, 'কিশের কার্ড?'  
 'বিয়ে করছি। বিয়ের কার্ড। আপনি অসুস্থ মানুষ যেতে পারবেন বলে মনে হয় না।'  
 'আপনি বিয়ে করবেন আর আমি যাব না, তা কি করে হয়। আমি এখুঁলে করে হলেও আপনার বিয়েতে যাব।'  
 সারাদিন আমি বিয়ের কার্ড দিয়ে বেড়ালাম। কেউ বাদ পড়ল না। ডিস্ক্রিক মেছকান্দর মিয়াও একটা কার্ড পেল। আমি বললাম, 'ডিস্ক্রিক সাহেব মনে করে যাবেন কিন্তু। কাপড় চোপড় যা আছে তাতেই চলবে শুধু পাখরটা সঙ্গে নেন না। ড্রপিকট হয়ে গেলে অসুবিধা আছে।'  
 মেছকান্দর বিড় বিড় করে বলল, 'কি কন কিছুই বুঝি না।'  
 'আমি বিয়ে করছি বিয়ের দাওয়াত।'  
 'সব আপন বড় ভাত করুন।'  
 'আচ্ছা যাও আর ভাত করব না। ভাল কথা তোমার পাথর কিন্তু এখনো কিনতে পারি। লাষ্ট প্রাইস কুড়ি হাজার টাকা।'

'পাথর বেচুম না।'  
 বিয়ের দাওয়াত সবাইকে দিলাম শুধু ইয়াকুব সাহেবকে পাওয়া গেল না। তাঁর খোঁজে গিয়ে শুনলাম পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে তিনি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছেন। বাড়িওয়ালা বের হয়ে আমার সঙ্গে খুব হস্তিহি করতে লাগল, আপনি যদি তার রিসেটিভ হন তাহলে খবর আছে। আপনার পলায় গম্ভা দিয়ে আমি টাকা আদায় করব।  
 আমি বিনীতভাবে বললাম, আমিও আপনার মতই পাওনাদার। আজ আমাকে টাকা দেবার কথা।  
 'আপনার কত টাকা পেছে?'  
 'প্রায় দশ হাজার।'  
 'কি বুকম হারামজাদা লোক আপনি করনাও করতে পারবেন না। মধুর ব্যবহার। যেদিন চলে যাবে সেদিনও আমাকে বাসায় ডেকে এনে চা খাইয়েছে। বাসার প্রতিটা জিনিস এর মধ্যে সরিয়ে ফেলেছে। কিছু বুঝতে পারি নাই। একটা ডাবল খাট ছিল সেই খাটও নাই।'  
 'বলেন কি?'  
 'এত বড় খাট কি করে সরাল সেটাই আমার মাথায় আসে না।'  
 'এডভান্স না রেখে বাড়ি ভাড়া দেয়া ঠিক হয় নাই।'  
 'অতি সত্য কথা বলেছেন। কথা দিয়ে তুলিয়ে ফেলেছে। আমার স্ত্রী এখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।'  
 'হাসাহাসি করারই কথা।'  
 বাড়িওয়ালা আমাকে ছাড়লেন না। চা বিস্কিট খাওয়ালেন। দেশ যে মানুষের বদলে মানুষে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছে ছাড়া পেলাম। বাকি রইল শুধু রূপা। রূপার কাছে যেতে ভয় ভয় করছে। সে কি বলবে কে জানে।  
 রূপা কার্ড হাতে নিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'কার্ডটা খুব সুন্দর। তুমি কিনেছ?'  
 'না। আমার খালা কিনেছেন।'  
 'ধবধবে সাদা কার্ডে রূপালী লেখা। জোছনা জোছনা ভাব। তোমার বিয়েও তো দেখি পূর্ণিমা রাতে।'  
 'ঐ দিন পূর্ণিমা?'  
 'আজকাল জোছনার হিসাব রাখ না?'  
 'না।'  
 'আমি রাখি। তোমার বিয়ে পূর্ণিমার রাতেই হচ্ছে।'

'একসেলেট! রূপা তুমি বিয়েতে যাচ্ছ তো?'  
রূপা আবারো হাসল। এমনিতে সে খুব কম হাসে। ছোটবেলায় কেউ বোধ-  
হয় তাকে বদলেছিল— তাকে বিষণ্ণ অবস্থায় দেখতে ভাল লাগে। ব্যাপারটা তার  
মাথায় ঢুকে গেছে। সে সারাক্ষণ বিষণ্ণ থাকে। আজ হাসছে। এর মধ্যে তিনবার  
হাসল।

'হাসছ কেন রূপা?'  
'তুমি বদলে যাচ্ছ— এই জন্যে হাসছি। মানুষকে তুমি আগে ধোঁকা দিতে  
না। এখন দিচ্ছ।'

'কাকে ধোঁকা দিচ্ছ?'  
'তামান্না নামের মেয়েটাকে দিচ্ছ। বিয়ের রাতে সবাই উপস্থিত হবে। তুমি  
হবে না। তুমি জোছনা দেখতে জঙ্গলে চলে যাবে। মেয়েটার কি হবে ভেবেছ  
কখনো?'

'এমন যদি আমি করি তামান্নার কিছই হবে না। তামান্নার জন্যে একজন  
স্ট্যান্ডবাই বর আছে। ফাতেমা খালার ম্যানেজার বুলবুল সাহেব। তার সঙ্গে বিয়ে  
হয়ে যাবে। বাকি জীবন দু'জনে সুখেই কাটাবে।'

'ওরা দু'জন বিয়ে করবে ভাল কথা— মাঝখানে তুমি জড়ালে কেন?'

'আমি না জড়ালে বিয়েটা হত না।'

'তোমার সমস্যা কি জান হিমু? তোমার সমস্যা হল নিজেকে তুমি খুব  
গুরুত্বপূর্ণ মনে কর।'

'সেটা কি দোষের? সামান্য যে বালিকগা সেও নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে  
করে।'

'বালির কথা এই কথা তোমাকে বলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

রূপা আবারো হাসল। এই নিয়ে সে হাসল চারবার। পঞ্চমবার হাসলেই  
ম্যাজিক নাথার পূর্ণ হবে। তখন আমাকে উঠে পড়তে হবে।

'রূপা!'

'কল জন্মি।'

'অনেকদিন জোছনা দেখা হয় না। গাজীপুরের জঙ্গলে আমার সঙ্গে জোছনা  
দেখবে?'

রূপা পঞ্চমবারের মত হেসে উঠে বলল, 'না।'



ব্যাঙাটি বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

আমি বললাম, 'গাজীপুরের শালবনে। জোছনা দেখব। জঙ্গলের জোছনা  
তুলনহীন। একবার ঠিকমত দেখলে জোছনা মাথার ভেতর ঢুকে যায়। জীবনটা  
অন্য রকম হয়ে যায়।'

'আজ না তোর বিয়ে? আমি গিফট কিনে রেখেছি। তোর ভাবী পার্লার  
থেকে চুল বাঁধিয়ে এনেছি।'

'বিয়ে ভেঙ্গে গেছে।'

'সেকি?'

ব্যাঙাটি অসম্ভব মন খারাপ করল। সে মমতামাথা পলায় বলল, 'তোর  
ভাগ্যটা এত খারাপ কেন দেখ!'

'জানি না।'

'এই দেখ তোর জন্যে আমার চোখে পানি এসে গেছে।'

'আমার সঙ্গে জোছনা দেখতে জঙ্গলে যাবি?'

'অবশ্যই যাব। তুই যেখানে যেতে বলবি সেখানে যাব। তুই যদি নর্দমায় গলা  
পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে বলিস তাই করব।'

'বিয়ে বাড়ির চমৎকার খাওয়া মিস করবি মন খারাপ লাগছে না?'

'না দোস্ত লাগছে না। মন খারাপ লাগছে তোর জন্যে। তোর ভাগ্য দেখি  
আমার চেয়েও খারাপ।'

জোছনা দেখতে রওনা হবার আগে তামান্নার সঙ্গে কথা বললাম। কমিউনিটি  
সেন্টারে টেলিফোনে খুব সহজেই তাকে ধরা গেল। সে টেলিফোন তুলে প্রথম  
যে কথাটা বলল, তা হচ্ছে— 'আপনি আসছেন না, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি যা চেয়েছিলে তাই হচ্ছে।'

তামান্না বলল, 'ওনুন, আমি মত বদলেছি। আপনি আসুন। আপনাকে আগে  
অনেক কঠিন কঠিন কথা বলেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। পূঁজ আপনি আসুন।'

'ম্যানেজার বুলবুল সাহেব আছেন। তিনি তোমাকে খুবই পছন্দ করেন। তোমার বিয়ে হবে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে।'  
 'আপনাকে কে বলল?'  
 'আমাকে কেউ বলেনি। তবে ম্যানেজার সাহেব ইচ্ছা পূরণ পাথরে হাত রেখে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাথর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছে।'  
 'প্লীজ আপনি আমাকে রূপকথা শুনাবেন না; পৃথিবীটা রূপকথা নয়।'  
 'কে বলল পৃথিবী রূপকথা নয়?'  
 'আপনি আসবেন না?'  
 'না। আজ আমার জোছনা দেখার নিমন্ত্রণ।'  
 'হিমু সাহেব শুনুন...।'  
 আমি টেলিফোন রেখে দিলাম।

গাজীপুরের জঙ্গলে ঢোকান মুখে দেখি একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি নষ্ট স্টার্ট নিচ্ছে না। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং দু'টা বড় বড় মেয়ে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন। হাত উঁচিয়ে হাইওয়ের গাড়ি থামতে চাইছেন। কোন গাড়ি থামছে না। বাংলাদেশের হাইওয়ের নিয়ম-কানুন পাশ্টে গেছে। হাইওয়েতে গাড়ি চালাবার প্রথম নিয়ম হচ্ছে কোন বিপদগ্রস্ত পথে দেখলে গাড়ি থামাবে না। গাড়ি থামালেই বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে হবে। তোমার দেরি হয়ে যাবে। তুমি নিজেও বিপদে পড়তে পার। কি দরকার।  
 আমি ব্যাঙটিকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ব্যাঙটির বিশাল শরীর দেখে মেয়ে দু'টি ভয়ে অস্থির হয়ে গেল। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনাদের সমস্যা কি? গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না?'  
 ভদ্রলোক বললেন, 'না।'  
 আমি বললাম, 'আমার এই বন্ধু অটোমোবাইল ইনজিনিয়ার। গাড়ির বনেট খুলুন ও দেখুক।'  
 ভদ্রলোক অনিচ্ছার সঙ্গে গাড়ির বনেট খুললেন। ব্যাঙটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট করে দিল।  
 ভদ্রলোকের চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা। মেয়ে দু'টি আনন্দে চোঁচাচ্ছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, 'ভাই, আমরা দু'ঘণ্টা ধরে জঙ্গলে পড়ে আছি। কি করে যে আপনাদের স্বপ্ন শোধ করব।'  
 আমি ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। গজীর গলায় বললাম, 'স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

ভদ্রলোক বিপিত গলায় বললেন, 'জ্বি না।'  
 'আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি খুব উঁচু পদের একজন মিলিটারী অফিসার না?'  
 'আমি সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে খুশুরবাড়ি যাচ্ছি।'  
 'অনেককাল আগে আপনি আমাকে একটা লিফট দিয়েছিলেন। এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে?'  
 'ও আশা হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'  
 'আমি সেই ব্যক্তি। আমার খুব ইচ্ছা ছিল আবার যেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হয়েছে।'  
 'আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?'  
 'জানতে পারেন। কিন্তু নাম জানার দরকার আছে কি? আমি আপনার নাম জানি না। আপনিও আমারটা জানেন না। আমরা না হয় আমাদের নাম নাই জানলাম। রাত অনেক হয়ে গেছে। আপনারা রওনা হয়ে যান।'

আমি ব্যাঙটিকে নিয়ে শালবনে ঢুকলাম। দু'জনে এগুচ্ছি — জমেই ঘন বনে ঢুকে যাচ্ছি। ব্যাঙটিকে বললাম, 'কি রে ভয় লাগছে?'  
 ব্যাঙটি বলল, 'একটু লাগছে।'  
 'কিধে লাগছে?'  
 'হুঁ'  
 'আজ তুমি জোছনা খেয়ে পেট ভরাবি।'  
 'জোছনা কি করে খাব?'  
 'ভাত মাছ যেভাবে খায় সেভাবে খাবি। হা করবি, মুখে চাঁদের আলো পড়বে। সেই আলো কৌৎ করে গিলে ফেলবি। তারপর দেখবি আর কোনদিন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে না। তোর কিধে রোগ সেরে যাবে।'  
 'সত্যি?'  
 'হ্যাঁ সত্যি।'  
 বনভূমিতে মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। জায়গাটা চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। আমি আমার দীর্ঘ জীবনে এমন আলো দেখিনি। ব্যাঙটির দিকে তাকলাম। সে চাঁদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর পর মুখ

বন্ধ করে জোছনা খাবার ভঙ্গি করছে। ব্যাঙাটি এক ধরনের খেলা খেলছে কিন্তু সে জানে না এই খেলা তার রক্তে ঢুকে যাচ্ছে। বাকি জীবনে সে আর এই খেলা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

ব্যাঙাটি হঠাৎ অবাক গলায় বলল, 'হিমু! কি ব্যাপার বল তো? আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ দেখি ধপ করে চাঁদটা অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। হচ্ছেটা কি?'

আমি কিছু বললাম না। শুধু যে চাঁদ নিচে নেমে আসছে তানা। আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি সেটাও বড় হতে শুরু করেছে। একসময় তা বিশাল এক খোলা প্রান্তর হয়ে যাবে। সেখানে ঠে খে করবে অবাক জোছনা। চাঁদ নেমে আসবে হাতের কাছে। হাত বাড়ালেই চাঁদ স্পর্শ করা যাবে। আমি অপেক্ষা করে আছি।



জন্ম : ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮  
ইংরেজী।

জন্মস্থান : নেত্রকোনা জেলার  
মোহনগঞ্জে, তাঁর মাতুলালয়ে।

বাবা : ফয়জুর রহমান আহমেদ,  
মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ সৈনিক।

মা : আয়শা আখতার।

দুমাধুন আহমেদ একসময় শিক্ষকতা  
করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

পড়াতে আর ভালো লাগে না বলে

চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর তিন

কন্যা, নোভা-শীলা-বিপাশা, এক

পুত্র নুহাশ। স্ত্রী ওলভেভিন খান।

অবসরে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুদের

নিয়ে খুব হৈচৈ করেন, এবং বলেন,

জনতার মধ্যেই আছে নির্জনতা।

আমার অনেক অনুসন্ধানের একটি অনুসন্ধান হল

নির্জনতার অনুসন্ধান।

**For More Books Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)  
[suman\\_ahm@yahoo.com](mailto:suman_ahm@yahoo.com)**